ছাত্র-জীবন।

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

30 CORNWALLIS STREET.

[illegible] সন।

সূচী পত্র

---

* ১৮৯৬ অব্দে মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নহে।

অশুদ্ধি-সংশোধিনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৬	ঘুরিয়া	ঘুরিয়া
২২	১২	বিংশ কোটি	বিংশতি কোটি
২৩	১৫	মহিমা মণ্ডিত	মহিমমণ্ডিত
”	১৯	মহিমা মণ্ডিত	মহিমমণ্ডিত
৪৬	১৭	অনবরতঃ	অনবরত
৫৫	১৭	লঘৃবিষ	লঘুবিষ
৫৯	১১	মূর্থ	মূর্খ
৬০	৭	অণমাত্র	অণুমাত্র
৭৭	১৬	স্বর্ণডিম্ব-প্রসূতি	স্বর্ণডিম্বপ্রসবী
১৪৯	২২	সুকৃমার	সুকুমার
১৫৩	৭	একটী	একজন
”	২১	বর্ত্তনাম	বর্ত্তমান
১৫৪	২২	সম্নন্ধ	সম্বন্ধ
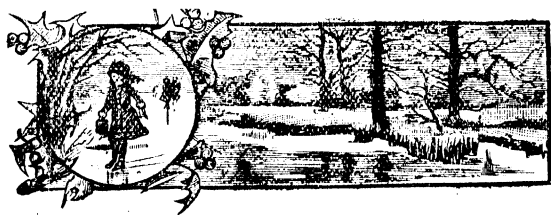
ছাত্র-জীবন।

মুখবন্ধ।

বালক যে সময় শিক্ষা আরম্ভ করে, গুরুর অধীন থাকিয়া যখন যত্ন ও আগ্রহের সহিত জ্ঞানের পথে পরিচালিত হইতে থাকে, জীবনের সেই প্রত্যূষ সময় হইতে সংসারী হওয়ার সময় পর্য্যন্ত কালকে ছাত্র-জীবন বলা যাইতে পারে। সমস্ত শৈশব ও যৌবনের কিয়দংশ ছাত্র-জীবনের অন্তর্ভূত। শিক্ষা যে ভাবেই সম্পন্ন হউক না কেন,—গৃহে আত্মীয়স্বজনের নিকট, বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের নিকট, ব্যবসায়াগারে ব্যবসায়ীর নিকট, শিল্পাগারে শিল্পীর নিকট,—এই দীর্ঘকাল সকলকেই ছাত্রভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে। ছাত্র-জীবন

শিক্ষার সময়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সকলের সমক্ষে সমভাবে বিরাজমান; মানবমাত্রেই প্রকৃতির সমরূপ কৃপার পাত্র। প্রকৃতি কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া অযাচিতভাবে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বিতরণ করিতেছেন না, কাহাকেও নিগ্রহ করিয়া যাচিত হইয়াও আপনার জ্ঞানরত্ন হইতে বঞ্চিত রাখিতেছেন না। যিনি স্বাধীনচেতা, কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ, অন্ধের ন্যায় পুরাতন পথের অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ, উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে নূতন পথের আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট, যুক্তি ও প্রত্যক্ষপ্রমাণব্যতিরেকে কোন কথা গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ, তাঁহার জীবনও ছাত্র-জীবন। কিন্তু সেরূপ ছাত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

আমরা একথা বলিতেছি না যে, সংসারী হইবামাত্র শিক্ষার প্রয়োজন শেষ হইল; পরন্তু সেই সময়েই প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় বিষয়ের স্থূল শিক্ষা হয় মাত্র; সংসার সেই স্থূল জ্ঞানের পরিণতি-ক্ষেত্র। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা শিক্ষা করিতে বালকের আদৌ অধিকার নাই। সংসার-প্রবিষ্ট যুবককে তৎসমুদয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। আবার জ্ঞান অনন্ত ও নিয়ত পরিবর্দ্ধনশীল; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিলেও

জ্ঞানের শেষ হয় না, অথবা জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং শৈশবই শিক্ষার সময় এরূপ বলিলে কথাটি ঠিক শুদ্ধ হয় না। সমস্ত জীবনই শিক্ষার সময়। তবে বাল্য-জীবন সাধারণ শিক্ষার সময়। এই গ্রন্থে শেষোক্ত সময়-কেই ছাত্র-জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। বালক তাহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে শিক্ষা করিবে, কি কি আচরণ করিবে, কি উপায়ে সংসারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমস্ত আলোচিত হইবেক।

ছাত্র-জীবন জীবনের বড় কঠিন অংশ। শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে সংসারী করা ছাত্র-জীবনের কার্য্য। মনুষ্যের জীবন অতীব বিস্ময়-কর। অসহায়, অজ্ঞান শিশুর অগঠিত মনেও বিধাতৃ-বিধানে জ্ঞানার্জ্জনের বলবতী বাসনা বিদ্যমান আছে। সেই অজ্ঞতা হইতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ, দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানহীন বালকের সূক্ষ্মদর্শিপ্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মানবজীবন সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিলে, মানবের কার্য্যকলাপ, জ্ঞানবিস্তার, ভ্রমপ্রমাদ, দোষগুণ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, মনে যে কত সুখ, কত দুঃখ, কত হর্ষ, কত বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। তাহার জ্ঞানবিস্তার, দেবোপম কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবার

ছাত্র-জীবন।

মুখবন্ধ।

বালক যে সময় শিক্ষা আরম্ভ করে, গুরুর অধীন থাকিয়া যখন যত্ন ও আগ্রহের সহিত জ্ঞানের পথে পরিচালিত হইতে থাকে, জীবনের সেই প্রত্যূষ সময় হইতে সংসারী হওয়ার সময় পর্য্যন্ত কালকে ছাত্র-জীবন বলা যাইতে পারে। সমস্ত শৈশব ও যৌবনের কিয়দংশ ছাত্র-জীবনের অন্তর্ভূত। শিক্ষা যে ভাবেই সম্পন্ন হউক না কেন,—গৃহে আত্মীয়স্বজনেব নিকট, বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের নিকট, ব্যবসায়াগারে ব্যবসায়ীর নিকট, শিল্পাগারে শিল্পীর নিকট,—এই দীর্ঘকাল সকলকেই ছাত্রভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে। ছাত্র-জীবন

শিক্ষার সময়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সকলের সমক্ষে সমভাবে বিরাজমান; মানবমাত্রেই প্রকৃতির সমরূপ কৃপার পাত্র। প্রকৃতি কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া অযাচিতভাবে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বিতরণ করিতেছেন না, কাহাকেও নিগ্রহ করিয়া যাচিত হইয়াও আপনার জ্ঞানরত্ন হইতে বঞ্চিত রাখিতেছেন না। যিনি স্বাধীন-চেতা, কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ, অন্ধের ন্যায় পুরাতন পথের অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ, উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে নূতন পথের আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট, যুক্তি ও প্রত্যক্ষপ্রমাণব্যতিরেকে কোন কথা গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ, তাঁহার জীবনও ছাত্র-জীবন। কিন্তু সেরূপ ছাত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

আমরা একথা বলিতেছি না যে, সংসারী হইবামাত্র শিক্ষার প্রয়োজন শেষ হইল; পরন্তু সেই সময়েই প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় বিষয়ের স্থূল শিক্ষা হয় মাত্র; সংসার সেই স্থূল জ্ঞানের পরিণতি-ক্ষেত্র। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা শিক্ষা করিতে বালকের আদৌ অধিকার নাই। সংসার-প্রবিষ্ট যুবককে তৎসমুদয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। আবার জ্ঞান অনন্ত ও নিয়ত পরি-বর্দ্ধনশীল; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিলেও

জ্ঞানের শেষ হয় না, অথবা জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং শৈশবই শিক্ষার সময় এরূপ বলিলে কথাটি ঠিক শুদ্ধ হয় না। সমস্ত জীবনই শিক্ষার সময়। তবে বাল্য-জীবন সাধারণ শিক্ষার সময়। এই গ্রন্থে শেষোক্ত সময়-কেই ছাত্র-জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। বালক তাহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে শিক্ষা করিবে, কি কি আচরণ করিবে, কি উপায়ে সংসারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমস্ত আলোচিত হইবেক।

ছাত্র-জীবন জীবনের বড় কঠিন অংশ। শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে সংসারী করা ছাত্র-জীবনের কার্য্য। মনুষ্যের জীবন অতীব বিস্ময়-কর। অসহায়, অজ্ঞান শিশুর অগঠিত মনেও বিধাতৃ-বিধানে জ্ঞানার্জ্জনের বলবতী বাসনা বিদ্যমান আছে। সেই অজ্ঞতা হইতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ, দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানহীন বালকের সূক্ষ্মদর্শিপ্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তি সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মানবজীবন সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিলে, মানবের কার্য্যকলাপ, জ্ঞানবিস্তার, ভ্রমপ্রমাদ, দোষগুণ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, মনে যে কত সুখ, কত দুঃখ, কত হর্ষ, কত বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। তাহার জ্ঞানবিস্তার, দেবোপম কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবার

আহ্লাদে উল্লসিত হইতে হয়; আবার তাহার মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও তজ্জনিত শোচনীয় পরিণাম পরিদর্শন করিয়া, শোকে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় মর্ম্মাহত হইতে হয়। ছাত্র-জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ভূলোকবাসী মানব দেবলোকবাসের উপযুক্ত হয়, আবার তাহার দুর্ব্ব্যবহারে সেই মানব নরকেও স্থান পায় না। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় যথাতথ সমালোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর নয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কেবল ছাত্রজীবনের গঠন, ঐ অবস্থার কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথার সমালোচনা হইবে। চরিত্রই জীবন-বৃক্ষের মূল, স্বাবলম্বন তাহার কাণ্ড, শিক্ষা তাহার শাখাপ্রশাখা, মিতব্যয়িতা এবং মিতাচারিতা তাহার পত্রপল্লব, এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাহার পুষ্প ও ফল। সুতরাং ছাত্রজীবন পর্য্যালোচনা করিতে হইলে চরিত্র, স্বাবলম্বন, শিক্ষা, মিতব্যয়িতা ও মিতাচারিতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এই কয়েকটি বিষয়েই উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়

চরিত্র।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে ভাবে আচরণ করে, আপনা হইতে যে প্রণালীতে তাহার মন ও কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহাই তাহার চরিত্র। যাহা একবার গঠিত হইলে সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, একবারে প্রকৃতিগত, স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাই চরিত্র। জীবনের সেই স্বভাবজ গতিবিধি, রীতিনীতি, আচারব্যবহার চরিত্র বলিয়া অভিহিত। চরিত্র অদৃশ্যভাবে, জ্ঞানের অগোচরে তিল তিল করিয়া গঠিত হয়। কবে হইল, কিরূপে হইল, অন্যরূপ না হইয়া এরূপ হইবারই বা কারণ কি, তাহা শেষে চিন্তা করিয়াও অবধারণ করা যায় না। বস্তুর বর্ণের ন্যায়, অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের ন্যায়, চরিত্র মনুষ্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিরূপে যে

উভয় এক হইয়া যায়, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।

কেবল চরিত্র শব্দ ব্যবহার করিলে এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ সচ্চরিত্রই বুঝিয়া লই। চরিত্রবান্, চরিত্রশীল প্রভৃতি শব্দ এক্ষণে আদর্শ-চরিত্রের মহাপুরুষকেই লক্ষ্য করে। যদি মন্দ বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে কু, অসৎ, অসাধু, ঘৃণিত প্রভৃতি শব্দদ্বারা চরিত্রকে বিশেষ করিয়া থাকি। বাস্তবিক চরিত্র শব্দে কু, সু, উভয়বিধ চরিত্রই বুঝায়।

কাহার কিরূপ চরিত্র, অর্থাৎ কাহার আচরণ কিরূপ, কে কিরূপে চলে, তাহার স্বভাব কেমন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। আমরা অনেক সময় লোকচরিত্র বুঝিতে পারি না; বাহিরে যাহা দেখি তাহাতেই বিমুগ্ধ হই, ভিতরে কি আছে তাহা অনুসন্ধান করি না; অথবা যদি অনুসন্ধান করি, তাহা এত সামান্য-ভাবে করি যে সত্য নির্ণয় হয় না; সুতরাং আমরা অতি সহজে প্রতারিত হই। সংসারে কপটের সংখ্যা অল্প নহে;—জগতে কপটতার কৌশল বাহ্যসভ্য-তার সহিত দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; সুতরাং সরল-মতি লোকে অতি সহজে প্রতারিত হয়। এখনকার লোকের চরিত্রের দুইটী পৃষ্ঠ আছে, একটী অন্ধ-কারময়, আর একটী আলোকময়। একটীর নাম

গোপনীয় বা ব্যক্তিগত চরিত্র,—তাহা পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক, অন্যে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিবে না;—বলিলে তাহা ভদ্রতা বা সভ্যতা-বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। চরিত্রের যে অংশে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্যের সহিত কার্য্য করে, তাহা সাধারণ বা সামাজিক চরিত্র। এখনকার লোকে সচরাচর সামাজিক চরিত্রই সমালোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বিভেদ নিন্দনীয়। যিনি প্রকৃত সাধু, তাঁহার চরিত্র পরোক্ষে ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে, ব্যক্তিগত ব্যবহারে ও সামাজিক ব্যবহারে সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসনীয়।

বাহ্য আকারের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাকে আমরা সুন্দর দেখি, মন তাহার দিকে সহজেই ধাবিত হয়; তাহার দোষ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে গুণটিই যেন আমাদের চক্ষে ভাসে। যাহা কিছু দেখিতে কদর্য্য, তাহাতে প্রথমেই একটী ঘৃণার ভাবের উদ্রেক হয়। ঐ যে একটী লোক পথপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে, পথিকগণের মুখের দিকে করুণা-সলিল-কণার প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ চাহিয়া আছে;—উহার শরীরে গলিতকুষ্ঠ দেখিয়া পথিকগণ পথের অপরপার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে,—পাছে নিকটে যাইয়া একটী পয়সা দিলেও ঐ সংক্রামক মহারোগ কোনরূপে স্পর্শ করে। আর ঐ যে একটী সুন্দর পুরুষ বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশো-

ভিত,—অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণ-চেইন, হস্তে হেমশীর্ষবেত্র ;—যে কথা কহিবার সময় বড় বড় গ্রন্থকারের মত প্রমাণস্বরূপ অনর্গল আবৃত্তি করিতেছে, যাহার মৃদুমধুর হাস্য ও বাক্‌পটুতা মনোমুগ্ধকরী, যাহার শুভ্র বসন, মার্জ্জিত দশন, কুঞ্চিতকেশ, পরিচ্ছন্নবেশ, সকলের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে ;—উহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে, উহার সহিত আলাপ করিতে, একবার উহার সহিত মিশিতে, সকলেই কেমন ব্যগ্র !

এখন ঐ দুইজনের চরিত্র বিচার কর ;—উহাদের প্রকৃত ইতিহাস বলিতেছি। মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি অতি উদারপ্রকৃতি ;—ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় আস্থা, ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গুরুজনের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। তাঁহার চিত্ত সরল। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন ; জীবনে কোন রূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন নাই। তিনি কখনও কাহারও কুৎসা বা নিন্দা করেন নাই, অনৃতবাক্যে তাঁহার পবিত্র রসনা একবারও কলঙ্কিত হয় নাই। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ; দান এবং অতিথি-সেবা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। পরিবারের সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত, সমাজের সকলে তাঁহাকে আদর ও সম্মান করিত। পরদুঃখ দেখিলে তাঁহার আত্মা গলিয়া যাইত। একদা নিরাশ্রয় একটী মহাব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় ; তিনি

তাহাকে আপন বাটীতে আশ্রয় দিয়া, স্বহস্তে তাহার ক্ষত স্থান সকল ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইনি নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কেহ এখন বর্ত্তমান নাই। পরসেবায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিয়া এখন ইঁহার এই দুরবস্থা।

আর, ঐ যে ভদ্রবেশধারী যুবক দণ্ডায়মান, যাহার কথা শুনিবার জন্য এত লোক উৎকর্ণ, যাহার একটুকু হাসি দেখিবার জন্য এত চক্ষু বিস্ফারিত, তাহার অবস্থা কি? তাহার অন্তরে কুপ্রবৃত্তিরূপ গলিত কুষ্ঠ,—সে ঘা গুলি অতি ভয়ানক; তাহা কখনও ধৌত হয় নাই, ভ্রমেও কেহ তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করে নাই। হতভাগ্য চিরকাল রোগ গোপন করিয়া হৃদয়ে পুষিয়াছে, এখন তাহার সমস্ত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু সে কপট; লোকের নিকট প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার নিমিত্ত বাহিরে হাস্যমুখ। সংসারের সমস্ত পাপকার্য্যে তাহার আসক্তি। তাহার মনোবৃত্তিনিচয়ে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পবিত্র ছিল, সে সমস্ত নষ্ট হইয়াছে; তাহার উপর দুষ্প্রবৃত্তিনিচয় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নৃত্য করিতেছে। তাহার শরীরে দয়ার লেশ নাই, পাপের ভয় নাই। তাহার কুকর্ম্মে অরুচি নাই, বীভৎসে ঘৃণা

নাই, নীচকার্য্যে অপমান নাই; অসত্য ব্যবহারে ধৃত হইলেও সে অপমান বোধ করে না। সে কুকার্য্যে অপব্যয়ী, সৎকার্য্যে ব্যয়কুণ্ঠ। পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরনিন্দা পরশ্রীকাতরতা তাহার প্রকৃতিগত। পরের বিপদে তাহার আহ্লাদ, পরের অনিষ্টে তাহার অনুরাগ। সে গুরু মানে না, এবং ভ্রমেও লব্ধোপকার স্বীকার করে না। সে মুখে যাহার সহিত মধুরালাপ করিতেছে, মনে তাহারই অনিষ্টকামনা করিতেছে। তাহার নিকট সংসারে কেহই ভাল লোক নহে, সকলেই আত্মবৎ। পরমপবিত্র মহাপুরুষও তাহার নিকট মন্দ। সে পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করে না। যাহার হৃদয়ে কোন রূপ বিশ্বাস আছে, তাহার বিবেচনায় সে অতি নির্ব্বোধ। যে তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহার মৃদুমধুর আলাপে আকৃষ্ট হইয়া সদুপদেশ এবং উপকার লাভজন্য তাহার প্রতি নির্ভর করে, সেই সরলহৃদয় সাধু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে সে সতর্ক। এখন বল দেখি, বাহিরের মহারোগাপেক্ষা ভিতরের মহারোগ অধিক ভয়ানক কি না? শরীরের গলিতকুষ্ঠাপেক্ষা মনের গলিতকুষ্ঠ অধিক ঘৃণিত কি না? আকৃতি দেখিয়া তুমি যাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছিলে, তিনি দেবতা; আর আকৃতি দেখিয়া যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলে, সে নরপিশাচ। আকৃতি অকিঞ্চিৎকর; প্রকৃতিই সর্ব্বস্ব।

আকৃতি দেখিলে কেবল ভ্রম জন্মে; প্রকৃতিই প্রকৃত পথ প্রদর্শন করে।

বাস্তবিক বাহিরের গলিতকুষ্ঠ তত সংক্রামক, তত ভয়ানক নহে। ভিতরের গলিতকুষ্ঠ তদপেক্ষা লক্ষগুণে সংক্রামক, মারাত্মক ও ভয়াবহ। বাহিরে যাহা দেখা যায়, তাহার চিকিৎসা আছে,—সহজে ধৌত করা যায়, ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ইচ্ছা করিলে স্পর্শ না করিলেও চলে। কিন্তু কপট পাপীর মনের ঘা সহজে কেহ দেখিতে পায় না; সে গোপন করে, চিকিৎসা করায় না। তোমার সন্দেহ নাই, তাহার মনে তোমার সরল মন মিশ্রিতে দিতেছ, তোমার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার মনের রোগ তোমার মনে সংক্রামিত হইতেছে, মনে ঘা বসিতেছে। তুমি তাহা দেখিতেছ না, বুঝিতেছ না, অথচ সুন্দর মনটি পচিতেছে। যাহা দেখা যায়, তাহা সহসা প্রাণনাশক হয় না। তোমার গন্তব্য পথে একটী কূপ আছে দেখিতেছ, তুমি একটুকু ঘুরিয়া গেলে, বিপদ্ হইল না। কিন্তু সেই কূপ যদি তৃণদ্বারা ঢাকা থাকে, তাহা হইলে তোমার পতন নিশ্চয়। সিংহব্যাঘ্রাদির ন্যায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুও দৃষ্টিগোচর হইলে প্রাণরক্ষার উপায় হইতে পারে, কিন্তু তোমার অঙ্গুলির ভর সহ্য করিতে পারে না এমন ক্ষুদ্র সর্পও অন্ধকারে দংশন করিয়া তোমার প্রাণনাশ করিতে

পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, সংসারে অধিকাংশ লোক এমনই স্থূলদর্শী, এমনই ভ্রান্ত, যে, বাহ্য শোভা দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, অভ্যন্তরের অবস্থা বুঝিতে পারে না। তাহারা পাপীর সহিত অবস্থান করে, পাপীর সঙ্গলাভ সুখকর মনে করে, পাপীর আপাত-মধুর আলাপে মুগ্ধ হয়, পরিশেষে তিল তিল করিয়া মানসিক মহাব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমস্ত জীবন পচিয়া গলিয়া মরে, এবং যে ভাবে আপনারা গিয়াছে, সেই ভাবে আরও দশ জনকে সঙ্গী করিয়া লয়।

চরিত্র বড় গুরুতর বিষয়, মানব-জীবনের সর্ব্বস্ব-ধন। যাহার সাধুচরিত্র আছে তাহার সমস্তই আছে,—সে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, রাজার রাজা, পণ্ডিতের পণ্ডিত। তাহার মনের সুখ অতি নির্ম্মল, অতি বিশুদ্ধ। যাহার চরিত্র-বল আছে, তাহার মনের বলও আছে। তাহার নিকট সংসার অবনতমস্তক। যে পাপপরায়ণ ব্যক্তি বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া সংসারে বিচরণ করে, কাহাকেও ভয় করে না, সেও চরিত্রবলে বলীয়ান কোন মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখিলে অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করে। সংসার পাপপূর্ণ হইলেও সতের সম্মান চিরদিন আছে, থাকিবে; অসতের প্রতি ঘৃণাও তদ্রূপ চিরকাল আছে, থাকিবে। রাবণ, দুর্য্যোধন, শকুনি বর্ত্তমান সময়ের কাহারও শত্রু নয়, আর রাম, কৃষ্ণ,

যুধিষ্ঠির কাহারও মিত্র বা স্বগণ নন। তথাচ রাবণ, দুর্য্যোধন, শকুনি এত ঘৃণার পাত্র কেন, তাহাদের পরাজয়বার্ত্তা পাঠ করিয়া লোকে এত প্রফুল্ল হয় কেন? আর রাম ও যুধিষ্ঠিরের বনবাস, দুঃখ দুর্দ্দশা পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কেন, তাঁহাদিগকে জয়লাভ করিতে দেখিয়াই বা মন এত উৎফুল্ল হয় কেন? সতে স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ এবং অসতে স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণাই কি ইহার কারণ নহে? যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোন কাব্য, নাটক বা উপন্যাসে মানবহৃদয় এত আলোড়িত হইত না। ইহাতেই বুঝা যায় যে সচ্চরিত্রই ঈশ্বরের অনুমোদিত; তাহা না হইলে উহা স্বভাবতঃ এত প্রীতির বিষয় হইত না। সুতরাং স্রষ্টার অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে হইলে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক।

সচ্চরিত্র হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সত্যে অনুরাগ থাকা আবশ্যক। যাহা সৎ তাহা সত্য যাহা অসৎ তাহাই অসত্য। সুতরাং সৎপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সত্যই প্রথম প্রয়োজনীয়। যাহাতে বালক কখনও অসত্য না বলে, মিথ্যা কথা কদাচ তাহার কর্ণগত না হয়,— বিবেচক মাতাপিতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের সর্ব্বদা তাহাতে সাবধান হইতে হইবে। যখন বালক ক্রন্দন করে, তখন তাহাকে ভূতের ভয়, পিশাচের ভয়, আরও দশ রকম কল্পিত ভয়ের আলাপ দ্বারা অবসন্ন রাখা

হয়। এ কার্য্যে যে কত দোষ, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। ঐ বালক বালিকা নিশ্চয় ভীরু হইবে, ভূতের ভয়ে দিনের বেলায়ও একাকী চলিতে পারিবে না। তাহাদের মন সঙ্কুচিত হইবে এবং অসত্য পথে প্রবেশ করিবার দ্বার প্রাপ্ত হইবে। অনেকে মিষ্ট বস্তু দিবার লোভ দেখাইয়া শিশুদিগকে শান্ত করেন। কিন্তু সেই আশা দিবার কালে উহা পূর্ণ করিবেন কি না, একবারও ভাবেন না। এইরূপ বৃথা আশায় শিশুগণ বাল্য হইতে মিথ্যাচরণে অভ্যস্ত হয়,—শিখে যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, মিথ্যা কথা বলাতে কোন দোষ নাই। এইরূপে অল্পে অল্পে অদৃশ্যভাবে যে কত শত শত কোমল নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না। সত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলে চরিত্র পঙ্কিল হইতে পারে না। "আমি যে কার্য্য করিব, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা আমায় প্রকাশ করিতে হইবে, আমি গোপন করিতে পারিব না, গোপন করা মনুষ্যের কার্য্য নহে," বালকের মনে যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে সে কখনও অসৎকার্য্য করিতে পারে না। অতএব চরিত্র-গঠন করিতে হইলে বালকের মনে সর্ব্বাগ্রে সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ উৎপাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সত্যের আদর শিক্ষা করিতে করিতে তৎসঙ্গে

আস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। আমি জীবনে যে কোন কার্য্য করি, তাহার শাসনকর্ত্তা ও পুরস্কর্ত্তা আছেন, সৎ কার্য্য করিলে পুরস্কার দিবেন, আর অসৎকার্য্য করিলে দণ্ড দিবেন, মনে এ বিশ্বাস না থাকিলে জনসাধারণের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্তি জন্মে না। কেবল তাহাই নহে ; যিনি এই মনুষ্যজন্ম প্রদান করিয়া আজ আমাকে প্রাণি-জগতের রাজা, সমস্ত সুখ-সম্পদের অধীশ্বর করিয়াছেন যদি আমি তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার না করি, তাঁহাকে একবার মনেও না করি, তাহা হইলে আমার মত অকৃতজ্ঞ আর কে আছে ? সুতরাং মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ অকৃতজ্ঞতা প্রথম হইতেই অভ্যাস হয়। যদি সম্পদের সময় গুণকীর্ত্তনের, আর বিপদের সময় নির্ভর করিবার একটী স্থল না থাকে, তাহা হইলে মানব-জীবন নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময় হয়

আস্তিকতাই সকল ধর্ম্মের মূল। তুমি যে ধর্ম্মেই বিশ্বাস কর না কেন,--হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টিয়ান হও, বৌদ্ধ হও—ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেই হইবে। আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাধা-রণ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। ঈশ্বরকে ভয় ও ভক্তি করিবে, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, পরের দ্রব্যে

লোভ করিবে না, উপায়হীনকে দয়া করিবে—এই সকল ও এইরূপ আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথমে এই সাধারণ ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়া পরে জাতিগত ধর্ম্মে সুশিক্ষিত হওয়া কষ্টসাধ্য নহে।

সাধারণ ধর্ম্মের মূলে সত্য এবং আস্তিকতা। যাহা কিছু সৎ তাহাই ধর্ম্ম, যাহা কিছু প্রাণিহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, ভালবাসা, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, ঔদার্য্য, সারল্য, সহিষ্ণুতা, স্বদেশানুরাগ, পাপে ঘৃণা, পুণ্যে আদর, সৎসঙ্গে আসক্তি, কুসঙ্গে ঘৃণা এ সমস্তই সাধারণ ধর্ম্ম। সকল দেশে, সকল ভাষায়,সকল শাস্ত্রে, এ কথা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে দ্বিধা নাই, মতভেদ নাই, সন্দেহ নাই; সমস্তজাতি একবাক্যে এসমস্ত স্বীকার করিতেছে। যে সকল বিষয়ে সমস্ত পৃথিবী একমত, তাহা অভ্রান্ত; সুতরাং চরিত্র-গঠন করিবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত গুণ শৈশবহইতে আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য।

সদানন্দ, নিষ্পাপহৃদয়, প্রফুল্লতাময় শিশুগণ কত সুখী! তাহাদিগকে দেখিয়া আমরাই বা কত সুখী হই! কেহ কি পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রস্ফুটিত বেলফুল দেখিয়াছ? কেহ কি শারদীয় প্রভাতে শেফালিকা পুষ্প স্তরে স্তরে উড়িতে পড়িতে দেখিয়াছ, বা বসন্তে বকুলবৃষ্টি

নিরীক্ষণ করিয়াছ? কেহ কি নৌকাপথে জ্যোৎস্না-স্নাত কুমুদরাশির, অথবা সৌরকর-প্রফুল্ল পদ্মবনের মধ্যদিয়া গমন করিয়াছ? তখন, অনিলে আন্দোলিত, তরঙ্গায়িত সেই বেল, শেফালিকা, বকুল, কুমুদ, কমল প্রভৃতি যদি সহৃদয়ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই সংসারক্ষেত্রে সঞ্চরমাণ কচি কচি বালক বালিকার চিত্রের সৌন্দর্য্য বুঝিতে তোমার কষ্ট হইবে না। শিশুর প্রফুল্লমুখ আর প্রস্ফুটিত কুসুম, উভয়ই এক,—মন আপনা হইতে দর্শনমাত্র তৃপ্ত হয়। উত্তাল-তরঙ্গ যেমন জলভার বহনে অসমর্থ হইলে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, উৎফুল্ল হৃদয়ের সে উল্লাসও যেন চারি-দিকে তেমনই ছড়াইয়া পড়ে। শিশুর হাসি উষাদেবীর প্রভাত-প্রচার,—আপনি হাসে, জগৎ হাসায়। সেই সারল্যপূর্ণ মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিবার সময় যদি কেহ মনে করে, একদিন এই অম্লান প্রফুল্লতা বিষাদে পরিণত হইবে, পবিত্রতার বিমল কৌমুদী পাপ-মেঘে আচ্ছন্ন হইবে, কুটিলতায় সরলতা গ্রাস করিবে; তাহা হইলে কাহার মন না দুঃখে অভিভূত হয়? কাহার চিত্ত না অবসন্ন হইয়া পড়ে? কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, অভিভাবকের অসাবধানতায়, শিক্ষার দোষে, অধি-কাংশ স্থলেই সেই পৌর্ণমাসীতে অমানিশির আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহারা যদি প্রথম হইতে সাবধান হন, যাহা

কিছু সৎ তাহাই বালকের সমক্ষে আনয়ন করেন, যাহা কিছু অসৎ তাহাই তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন, চরিত্র-গঠনে সর্ব্বদা সচেষ্ট রহেন, তাহা হইলে আর এ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে না।

সদ্দৃষ্টান্ত চরিত্র-গঠনের এক প্রধান সহায়। বানর অনুকরণপ্রিয় বলিয়া মনুষ্য তাহাকে লইয়া এত আমোদ করে। কিন্তু সংসারে নবাগত মানব যেরূপ অনুকরণ-পরায়ণ, বানর তাহার শতাংশের একাংশও নহে। নূতন মন নির্ম্মল দর্পণের ন্যায়; যাহা তাহার সমক্ষে ধর তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িবে। সুতরাং যে পিতা, বা গুরু আপন সন্তানসন্ততি বা শিষ্যকে সচ্চরিত্র করিতে চান, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে নিজের চরিত্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকলের চরিত্র সৎ করা উচিত; নতুবা তিনি কদাচ সিদ্ধার্থ হইবেন না। বালক বালিকা সংসারে শিক্ষার্থী; তাহাদের সমস্ত ক্রীড়া বৃদ্ধের কার্য্যকলা-পের অনুকরণ। পীতবর্ণ কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে শুভ্র বস্তুও পীত দেখায়; কিন্তু বর্ণান্তর-সংস্পর্শশূন্য ধবলকাচখণ্ডে সেরূপ দৃষ্টিভ্রম জন্মায় না। শিশুদিগের সম্মুখে নির্ম্মল-চরিত্র-দর্পণই স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে তাহারা বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইবে। নচেৎ কপটতার কৃত্রিম বর্ণে সকল পদার্থই বিকৃত দেখাইবে।

× রাজা অমিত ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতেছেন; কিন্তু উত্ত-

রাধিকারীকে শিক্ষিত ও চরিত্রশীল করিয়া রাখিয়া যাইতে না পারিলে সে নিঃস্ব, তাহার সম্বল কিছুই নাই—অর্থ আছে, তাহার সদ্ব্যবহার নাই ; সামর্থ্য আছে, তাহার প্রয়োগক্ষমতা নাই ; কার্য্যানুষ্ঠান আছে, যশ নাই ; তবে তাহার আছে কি ? তাহার অর্থ ঐ স্তূপাকার লোষ্ট্ররাশি হইতেও অকর্ম্মণ্য। লোষ্ট্ররাশি পড়িয়া আছে, কাহারও কিছু অনিষ্ট করিতেছে না ; কিন্তু চরিত্রবিহীনের স্বর্ণ-রাশি তাহার পাপ-বাণিজ্যের মূলধন, অনিষ্টের উপাদান এবং সর্ব্বনাশের প্রধান সাধন।

চরিত্রশীল ব্যক্তি নির্ধন হইয়াও ধর্ম্মরাজ্যের রাজা, চরিত্রহীন রাজা হইয়াও ধর্ম্ম-পথের ভিখারী। জটাবল্কল-ধারী বনবাসী রামে, আর স্বর্ণলঙ্কাধিপতি রাবণে ; ফল-মূলাহারী নিরাশ্রয় যুধিষ্ঠিরে, আর ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-রক্ষিত সম্রাট্ দুর্য্যোধনে ; পণ্ডিতবর নিউটনে, আর ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসে কত প্রভেদ ! রাম, যুধিষ্ঠির ও নিউটন চরিত্র-বলে অমর, আর রাবণ, দুর্য্যোধন ও চার্লস চরিত্রহীন বলিয়া মানবমণ্ডলীর ঘৃণার্হ।

চরিত্র-বল অসাধারণ। দৈহিকবল বা অর্থবল তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহার চরিত্র-বল আছে তাহার মন সর্ব্বদা সতেজ। সে অসাধ্যসাধনে সমর্থ। আপন চরিত্রে অটল বিশ্বাসই মনের বলের অস্থি-স্বরূপ। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অব্যর্থ ছিল ; এ কথার অর্থ এই যে,

স্বকীয় চরিত্রের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন তাঁহার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই; সুতরাং প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভগ্ন হইতে পারিবে না তাহাও তিনি জানিতেন। সেই জন্যই স্থির প্রতিজ্ঞার নাম আজ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মনের বলে তাদৃশ বিশ্বাস থাকাতেই শ্রীরামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিয়াছিলেন, "লোকসেবা-ব্রতপালনে যদি আমাকে স্নেহ, দয়া, সুখ-সম্ভোগ অথবা প্রিয়তমা জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি ব্যথানুভব করিব না।"

এথেন্স নগরীতে মহামারীর সময় এক ব্যক্তি তদীয় বন্ধু পণ্ডিতবর সক্রেটিস্‌কে স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি আমাকে এরূপ একটী স্থান দেখাইতে পারেন যে, সেখানে গেলে আমায় মরিতে হইবে না, তাহা হইলে আমি তথায় যাইতে সম্মত আছি।" কুচক্রীর ষড়্‌যন্ত্রে অন্য এক সময়ে এথেন্সের পাপাচার শাসনকর্ত্তারা যখন আদেশ দিলেন যে বিষপান করিয়া সক্রেটিস্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, তখন ঐ বন্ধু আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তুমি নিরপরাধে দণ্ডিত হইলে, এই দুঃখ।" মহাত্মা সক্রেটিস্ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, "আমি অপরাধী হইয়া

মরিলে কি আপনি অধিক সুখী হইতেন ?” লাটীনপতি লার্স পর্সেনা নবতি সহস্র যোদ্ধৃসহকারে নবজাত রোমীয় সাধারণতন্ত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। চরিত্রবলে বলীয়ান্ হরেসস্ কক্লিস্ নামক বীরপুরুষ টাইবর নদের সেতু-রক্ষার্থ দুইদিকে দুইটী মাত্র লোক লইয়া এই বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি বাধা দিতে লাগিলেন ; এদিকে রোমীয়েরা তদীয় পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সেতু ভাঙ্গিয়া দিল। নির্ভীক বীর তখন সশস্ত্র নদ মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন ; রোম রক্ষা পাইল। আবার একজন রোমীয় যুবক শত্রুনাশে বিফল-মনোরথ হইয়া ধৃত হইল। লার্স পর্সেনা শত্রুর গুপ্তমন্ত্র জ্ঞাত হইবার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। সে তখন হাসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আপনার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে গ্রন্থি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া বাহু দেহ হইতে স্খলিত হইল। রাজা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন,—দেখিলেন যুবকের মুখে হাসি, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নাই ; শুনিলেন এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আরও কত রোমীয় যুবক তাঁহার প্রাণবধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে,—বুঝিলেন যে এরূপ চরিত্রবান্ লোকের পক্ষে সঙ্কল্প ও কার্য্য একই কথা। বুঝিয়া,—নবতি সহস্র যোদ্ধার নায়ক একটী যুবকের চরিত্রবলে ভীত হইয়া—পলায়ন করি-

লেন। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে ফরাসী ভাষায় "অসম্ভব" অর্থবাচক কোন শব্দ নাই। নির্ভয়ে গর্ব্ব করিয়াছিলেন যে "যে গুলিতে আমার জীবন শেষ হইবে তাহার ছাঁচও আজ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই।" জুলিয়স্ কাইসার বলিয়াছিলেন, "আমি পৃথিবীতে যত প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মনুষ্য যে ভয় করে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য!" খালিফা ওমার বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মে যদি বিশ্বাস থাকে, কর্ম্ম কেন অসাধ্য হইবে?" এই সমস্ত মহাবাক্য কি সামান্য চরিত্র-বলের পরিচায়ক? আজ ইংরাজ যে এ দেশের রাজা, সে কি কেবল্ চরিত্র-বলে নহে? এদেশে অষ্টা-বিংশ কোটি লোক, ইংরাজ এক লক্ষের অধিক নহে; অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক তিন হাজার এদেশীয় লোকের মধ্যে একজন ইংরাজ। কিন্তু ইংরাজ নির্ভীক, তাঁহার মনের বল অসাধারণ। একটী বৃহৎ জেলা; অধিবাসীর সংখ্যা হয়ত ত্রিশ লক্ষ; তথাপি একজন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অনায়াসে শাসন করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে লক্ষপতি রাজাও কম্পমান। আর সেই একক ইংরাজ মনের বলে, চরিত্র-বলে এমনই বলীয়ান্ যে, তিনি একাই ত্রিশলক্ষ, আর ত্রিশলক্ষ লোক তাঁহার নিকট একাকী।

আর দৃষ্টান্ত-বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এবংবিধ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। প্রতি যুগে

শত শত সাধুচরিত্র মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, আপনার চরিত্র-বলে স্বশ্রেণীতে নৈতিক রাজত্ব করিয়া পরলোকগামী হইতেছেন। বালক! যদি মানুষ হইতে চাও, স্বশ্রেণীতে প্রধান হইতে ইচ্ছা কর, সকলের মনোমধ্যে অমররূপে বিরাজ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সাধুচরিত্র হইতে চেষ্টা কর। যদি মানব-ধর্ম্ম তোমার আয়ত্ত হয়, সতে প্রবৃত্তি ও অসৎ হইতে নিবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে মন সবল হইবেই হইবে। চরিত্র উন্নত হইলে মহত্ত্ব আপনা হইতে আসিবে। আপনার প্রতি, আপনার চরিত্রের এবং শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে বড় হওয়া বড় কঠিন নয়। তখন তোমার দেবোপম চরিত্রের নিকট সংসার নত হইবে। 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' (যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয় লাভ হয়) এটি ধ্রুব সত্য। হিমবদ্‌গৃহে মহাদেব বিবা-হার্থ উপস্থিত; তাঁহার সেই মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তির সমক্ষে হিমাচলের ভক্তি-পরবশ মস্তক আপনার অজ্ঞাত-সারেই নত হইল; হিমালয় তাহা জানিতেও পারিলেন না। মহাকবি কালিদাসের এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য। সাধুচরিত্র, মহিমামণ্ডিত-মূর্ত্তি, যশঃ-সৌরভ-সমাকীর্ণ মহাপুরুষের সমক্ষে জগৎ আপনার অজ্ঞাতসারে সর্ব্ব-দাই নতি-স্বীকার করিতেছে। সাধুচরিত্রের আদর যতকাল সৃষ্টি আছে, ততকাল থাকিবেই থাকিবে।

চন্দ্র সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া পড়ুক, সৃষ্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হউক, তথাপি সংসারে সতের সমাদর কমিবে না। যখন জগতে নাস্তিকতা ও পাপবৃদ্ধি, তখনই রাষ্ট্রবিপ্লব। জগতে সতের সমাদর রক্ষা করিতে ঐশ-হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত। অতএব, প্রিয় বালক! যদি তোমার মানবজীবন সফল করিতে চাও, তবে, কুসঙ্গ, কু-আলাপ, কুকার্য্য, সর্ব্বপ্রকার কু পরিত্যাগ কর। যাহা কু তাহাই কুৎসিত, কদাকার। তোমার শরীরটী কুৎসিত দেখাইবে এই ভয়ে তুমি কত ভীত! মন কুৎসিত না দেখায় তজ্জন্য তদপেক্ষা অধিক অবহিত হও। শরীর পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তুমি কত সচেষ্ট! মনকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন কর; সাধুসঙ্গে, সদালাপে, সৎকার্য্যানুষ্ঠানে তোমার জীবনপথে পবিত্রভাবে অগ্রসর হও।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা।

গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করাকে শিক্ষা কহে। মনুষ্যই একমাত্র গুরু বা শিক্ষক নহে; সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতি। চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ করিতেছ, যাহার আঘ্রাণ পাইতেছ, স্বাদ পাইতেছ, সে সমস্তই আজন্ম তোমাকে শিখাইতেছে। তোমার বাহিরে প্রকৃতি, অন্তরেও প্রকৃতি। তোমার চিন্তা এবং অনুশীলনের ফল প্রকৃতিলব্ধ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সমস্তই তোমার শিক্ষক। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ সকলই তোমার শিক্ষাগুরু। কি শারীরিক, কি মানসিক, তুমি যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে চাও, প্রকৃতি তোমায় সব শিখাইবে। মানবগণ জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যক্ষেত্রে নিয়ত শিক্ষালাভ করিতেছে;

ক্ষুদ্রকায় মক্ষিকা, অতি হেয় বালুকাকণা, সকলেই আমাদিগকে কিছু না কিছু শিখাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানব আর কাহারও গৌরব স্বীকার করিতে চায় না; আপনার গৌরবেই আপনি মত্ত।

এক একটী গুণ লইয়া এক একটী বস্তু বা প্রাণী সমালোচনা কর। মানব একতার গৌরব করে, কিন্তু দেখ দেখি পিপীলিকার ন্যায় একতা আজও সে শিখিয়াছে কি না? মৃত্তিকা বা প্রস্তরের মত সহিষ্ণুতা, বৃক্ষের ন্যায় উপচয়, পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনতা, সিংহ-শার্দ্দূলের ন্যায় শারীর বল, কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্তি, শশকের ন্যায় সতর্কতা, হরিণের ন্যায় দ্রুতগতি তাহার নাই। অনেক ইতর জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের ভয় অধিক। আমরা যাহা জানিনা তাহার সহিত, যাহা জানি তাহার তুলনা করিলে বুঝিতে পারিব, আমরা কতদূর অজ্ঞ; দেখিব এখনও কত শিখিতে বাকী আছে, বুঝিব যে হাজার হইলেও আমরা বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিতেছি এবং অনন্ত জ্ঞানরত্নাকর পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শিখিবার বিষয়ের অন্ত নাই, প্রণালীও বহুবিধ। এস্থলে সে সমস্তের সমালোচনা না করিয়া অতি স্থূল স্থূল কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইবে।

প্রথমতঃ বলা হইয়াছে শিক্ষা মানব-প্রদত্ত-উপদেশ-লব্ধ, অথবা প্রাকৃতিক জ্ঞানলব্ধ। আবার এই উভয় প্রকারের শিক্ষাই শারীরিক ও মানসিক, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রকৃতির পর্য্যালোচন ও গ্রন্থ-পাঠ মানসিক-শিক্ষার প্রধান সাধন। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ব্যবসায় ইত্যাদি শিক্ষা করাও মানসিক-শিক্ষার অন্তর্ভূত। সুতরাং শিক্ষা প্রথমতঃ (ক) শারীরিক এবং (খ) মানসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মানসিক-শিক্ষার সঙ্গে (১) প্রকৃতি-অধ্যয়ন, (২) গ্রন্থ-শিক্ষা বা অধ্যয়নলব্ধ শিক্ষা, (৩) ব্যবসায়শিক্ষা এবং (৪) সামাজিক-শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীর সবল হইলে মনও সবল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রথমতঃ শারীরিক শিক্ষার আলোচনা করা যাউক।

শারীরিক শিক্ষা।

সংসার বড় কঠিন স্থান। মানবশরীরে উপদ্রবের অন্ত নাই। ঝটিকা, শিলাবৃষ্টি, গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুর আবর্ত্তন, জলের তরঙ্গ, স্থলের হিংস্রজন্তু, আকাশের অশনি, ক্রূরস্বভাব মানবের অত্যাচার রোগশোকজরাদির আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ উপদ্রবে মানব সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং শরীরটীকে পৃথিবীতে বাসের উপযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। শীতাতপ-সহিষ্ণু, ঝড় বৃষ্টিতে অটল, শত্রুসমক্ষে স্থির, রোগের দুর্ভেদ্য, সুস্থ ও সবল শরীর লাভ করা সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করিলেই কার্য্য শেষ হইল না। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যেমন শিক্ষা করিতে হয়, কার্য্যক্ষম শরীর প্রস্তুত করাও তেমনিই শিখিবার বিষয়। কিন্তু এ শিক্ষা বড় কঠিন।

মানব যখন নিতান্ত শিশু ও নিরাশ্রয়, প্রকৃতি আপনা হইতে তখন শারীরিক শিক্ষা-দানের সূত্রপাত করেন। তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাসের শিশু শয্যায় শয়ান,—আমরা দেখিতে পাই, অনবরত তাঁহার হস্তপদ নড়িতেছে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে; বালক হাঁসিতেছে

শরীরের মধ্যভাগ বারবার উঠাইতেছে, শয্যায় আঘাত করিতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে তখন আমাদের মনে হয় শিশু খেলিতেছে। কিন্তু সে খেলা নিষ্কাম নহে; বালক তখন প্রকৃতির ক্রোড়ে থাকিয়া ব্যায়াম শিক্ষায় প্রবৃত্ত, সঞ্চালনদ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে সচেষ্ট, বাক্‌শক্তির স্ফুরণজন্য সর্ব্বদা অব্যক্ত-শব্দপরায়ণ, এবং হাস্য ও ক্রন্দনদ্বারা স্বরের পরিপুষ্টি-সাধনে তৎপর।

যাহারা স্কন্ধে ভার বহন করে, তাহাদের স্কন্ধদেশ এবং যাহারা মস্তকে ভার বহন করে, তাহাদের মস্তক কেমন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির হস্ত সবল। পদাতিক, তীর্থের পাণ্ডা প্রভৃতি পর্য্যটকগণের পা সবল। যাহারা সূচিকাদ্বারা সূক্ষ্মশিল্পের কার্য্য করে তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। যে নৌকা চালায় তাহার হস্তের বল অধিক। যে সন্তরণে পটু, তাহার হস্তপদ সমবলিষ্ঠ। এইরূপে সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা দ্বারা কোন না কোন রূপে তাহার শরীরের কোন না কোন অংশ সবল ও কার্য্যক্ষম হইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সঞ্চালন দ্বারা শরীর সবল হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীর কার্য্যক্ষম করিতে হইলে শরীর সঞ্চালন আবশ্যক। এই সঞ্চালন শিক্ষা বা ব্যায়ামই শারীরশিক্ষা এবং ইহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহার শরীর দৃঢ়, সুস্থ ও সবল, তাহার ন্যায় সুখী লোক সংসারে আর নাই। তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। সে ইচ্ছা করিলে প্রচুর পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম এবং আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে শরীর দৃঢ়, সুস্থ ও সবল হয়, সেই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম ব্যতীত শরীর দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিবার অন্য উপায় নাই। যে সমস্ত ব্যায়ামে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয় তাহাই প্রশস্ত। আমাদের দেশে পূর্ব্বে বালকদিগের জন্য যে সমস্ত খেলার নিয়ম ছিল, তাহাতে সমস্ত অঙ্গ বিলক্ষণ সঞ্চালিত হইত। ঐ সকল খেলার প্রধান কার্য্য দৌড়ান বা সন্তরণ। যে সমস্ত ক্রীড়ায় মন দৃঢ় হয়, তাদৃশ ক্রীড়াও বিস্তর ছিল। তখন অতি প্রত্যূষে সকলে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিত। তাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিত। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রণালীর যে সমস্ত ব্যায়াম অনুসৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় লোকের উপযোগী কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। এই প্রণালীর ব্যায়ামে যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন, তাহা অনেকের পক্ষে লাভ করা সুকঠিন। বয়োবৃদ্ধির সহিত আপনা হইতেই তাহা পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানও একেবারে বিফল হয়। বাল্য-

কালে যে প্রণালীর ব্যায়াম বালককে শিক্ষাদান করা যায়, অভিভাবকের স্মরণ করিতে হইবে যে বালক বড় হইলে যেন তাহা অভ্যস্ত রাখিতে লজ্জিত না হয়; অথচ সে ব্যায়াম যেন সকল শরীরের পক্ষে সমান উপকারী, এবং উপযোগী থাকে।

আজ কাল যে শত শত উপাধিধারী কঙ্কাল বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে, তাহাদের মুখের দিকে তাকাইলে কাহার হৃদয় না দুঃখে বিদীর্ণ হয়?—মুখমণ্ডল বিষাদমণ্ডিত, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু পরিবীক্ষণাবৃত,—দূরের বস্তু শাদাচক্ষে দেখিবার সাধ্য নাই,—আহারে অরুচি, আহারের শক্তি শিশুর অপেক্ষা অধিক নহে, সে আহারও জীর্ণ হয় না,—একবিন্দু বৃষ্টি বা একপলের প্রদোষানিল অসহনীয়, মুহূর্ত্তমাত্র রৌদ্রে বাহির হইবার শক্তি নাই, মুখের হাস্য কালশয্যায় শয়ান ব্যক্তির সুখসংবাদে বিষাদ-মিশ্রিত হাস্যের ন্যায়, অথবা বৃষ্টির সময়ে ক্ষণ-স্থায়ী রৌদ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ! এ দৃশ্য দেখিয়া কে অশ্রু সংবরণ করিয়া থাকিতে পারে? কেই বা তাদৃশ অধ্য-য়ন সুখকর মনে করে? সত্য বটে কঠিন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উচ্চ রাজকার্য্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! পদে কি হয়?—শরীর ত আর চলে না, মন অবসন্ন; কাজ করিতে ত প্রবৃত্তি হয় না। পরিশ্রমে অভ্যাস নাই—এত শারীরিক, মানসিক পরিশ্রম সহিবে কেন?

পরিণাম আরও শোচনীয়, অল্পদিনে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ। যে জীবন দীর্ঘ ও সুখময় হইত, তাহা শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন-বশতঃ নিতান্ত হ্রস্ব ও দুঃখময়। হতভাগ্য যুবক অকালে ইহলোক হইতে চলিয়া গেল; তাহার আত্মীয়স্বজন শোকসাগরে ভাসিতে লাগিল।

বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ চিত্র অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। যে কুঠারে শালবৃক্ষ ছেদন করিতে চাও, তাহা ফুলদলে প্রস্তুত হইতে পারে না, লৌহময় হওয়া আবশ্যক। সঞ্চালন দ্বারা দৃঢ়ীভূত না হইলে শরীর ফুলদলের ন্যায় কোমল থাকে, যেমন নবনীত অসম্পন্ন অবস্থায় বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, প্রায় তেমনই থাকিয়া যায়; সুতরাং অতি অল্পদিনে সে কুসুমকোমল শরীর রোগ-কীটদষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শৈশব হইতে পরিশ্রম অভ্যস্ত হইলে, এবং শীতাতপ, ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলে অধিক বয়সে কষ্ট পাইতে হয় না। পর্য্যটন, সন্তরণ ও অঙ্গচালনের সহায় ক্রীড়াকলাপ অভ্যস্ত রাখা কর্ত্তব্য। আজ কাল এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশেও অনেক পরিবারে বালক বালিকাকে শৈশব হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। ধাত্রীর ক্রোড়ে কুব্জ হয় হউক, চারি বৎসর বয়সে হাঁটিতে না পারুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; তথাপি সন্তানসন্ততি মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে লোকে বড়মানুষ বলিবে না, নিন্দা করিবে, অথবা

স্নেহ মমতা উথলিয়া পড়িবে;—এইরূপ অন্ধজ্ঞান ও অন্ধ-মমতায় দেশ অধঃপাতে যাইতেছে।

অভ্যাস বড় গুরুতর কথা। কথায় বলে "শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাও তাহাই সয়।" এ মহাসত্য কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। বাল্যকাল হইতে যাহা অভ্যাস করিবে তাহাই সহ্য হইবে। বিষ সদ্য প্রাণনাশক, কিন্তু অতি সামান্য মাত্রায় পান করিতে করিতে শেষে বিষেও প্রাণ নষ্ট হয় না। অভ্যাস-মাহাত্ম্যে যাহা একের পক্ষে অমৃত, তাহা অপরের পক্ষে বিষ, এবং যাহা একের পক্ষে বিষ, তাহা অপরের পক্ষে অমৃত।

আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, "আমার প্রপিতামহ বড় স্থূলোন্নত বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি পাঁচ মণ ভার তুলিতে পারিতেন; আমার পিতামহ তদপেক্ষা ন্যূন হইলেও বলবান্ ছিলেন; পিতা তদপেক্ষাও অনেক কম বলবান্ ছিলেন; আমি একবারে দুর্ব্বল। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইতেছে বলিয়াই মানবসমাজ এইরূপ অধঃ-পাতে যাইতেছে।" বাস্তবিক এ কথা যথার্থ যে আমাদের দেশে শারীরিক শক্তি ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসি-তেছে। কিন্তু তাহার কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। আমরা জানি, প্রপিতামহ বা পিতামহের সময়ে শরীরের উন্নতির পক্ষে বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল।

কতকগুলি এরূপ নির্দ্ধারিত শারীরিক নিয়ম ছিল, যে কেহ তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করুক আর নাই করুক, সকলেই তাহাদের অনুসরণ করিত। তাহাতে শরীর নিশ্চয় বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হইত এবং সুস্থ থাকিত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, প্রভাতে বিশুদ্ধ-সমীরণ-সেবন, প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন, সংযতচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা, যথাকালে পরিষ্কার স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য-গ্রহণ, শরীরের উন্নতিসাধক ক্রীড়ানুসরণ, সন্তরণ, পর্য্যটন, শরীরের বল-পরীক্ষা-করণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত পরিশ্রম ও অধ্যয়ন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ছিল। যে পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম চলিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত সকলেই সুস্থ, সবল, প্রফুল্ল-চিত্ত এবং সুখী ছিল। কালক্রমে আমরা সে সকলই ভুলিয়াছি; প্রভাতের সহিত অনেকেরই সাক্ষাৎ নাই; অঙ্গ-সঞ্চালন কাহাকে বলে জানি না। বালকে বালকে ক্রীড়াভাবে বল পরীক্ষা করিলেও এখন অসভ্যতা হয়। যাহারা 'ভাল ছাত্র' বলিয়া পরিচিত, তাহারা অহোরাত্র রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে পুস্তকে বদ্ধদৃষ্টি!

ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? তাঁহারা প্রতিদিন ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তি বোধ করেন না; তাঁহাদের যত্নের গুণে প্রস্তরময় ভূমিতে স্বর্ণ ফলিতেছে! আর আমাদের উদ্যমাভাবে উর্ব্বরা ভূমিও মরুময় হইতেছে! ইহার কারণ কি? আশৈশব শারীরিক

পরিশ্রমাভ্যাস ও তাহাতে আসক্তিই কি ইউরোপবাসি-গণের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ নহে? ইংলণ্ডের সর্ব্ব-প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ। তিনি এখনও প্রতি বৎসর শীতকালে অনুচরবর্গের সহিত একবার কাষ্ঠকর্ত্তন ক্রীড়ায় বাহির হন, এবং বড় বড় বৃক্ষ স্বহস্তে কাটিয়া ফেলেন। তেমন বৃদ্ধও ব্যায়াম করিতে বা খেলা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কালেজ বিভাগে অধিকবয়স্ক ছাত্রগণের মধ্যে নৌকা-চালনে ও ক্রিকেট খেলায় প্রতিযোগিতা আছে। রাজ-পুত্রেরাও ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাহার জন্য শিক্ষক আছে, নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; প্রতিদিন সে কার্য্য করি-তেই হইবে। যাহার শরীর দৃঢ়ীকৃত এবং সঞ্চালন দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মনও সতেজ এবং সবল না হইবে কেন? শরীরে বল থাকিলে সত্য বলিতে ভয় হয় না, মনের স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা জন্মে, শিক্ষায় প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং মনুষ্য দেখিতে দেখিতে উন্নতি লাভ করে। দুর্ব্বল শরীরে ভয়সঞ্চার স্বতঃসিদ্ধ, দুর্ব্বলের পক্ষেই ছলনা ও প্রতা-রণার প্রয়োজন। অতএব মন সবল করিতে হইলে,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে,—শরীরের পূর্ণতা সুস্থতা এবং সবলতার প্রয়োজন, এবং শারীরিক শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।

শরীর দৃঢ় ও সবল হইলেই যে শারীরশিক্ষার শেষ হইল এমন নহে; শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য অনেকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য সকল সুখের আকর। শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিতে না পারে, এবং দৈবাৎ প্রবেশ করিলেও স্থায়ী হইতে না পারে, অতি সাবধানে তাহা দেখা উচিত। আমরা দেখিতে পাই, একটী ঘটিকাযন্ত্র কার্য্যক্ষম রাখিতে কত সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ঘটিকাটী ভাল স্থানে থাকে, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়, প্রতিদিন যথানিয়মে, নির্দ্ধারিত সময়ে, তাহাতে চাবি দেওয়া হয়, এবং কোন রূপ মরিচা না লাগে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যদি কল কোনরূপে নষ্ট হয়, তবে তাহার জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন। মানব-শরীরও ঘটিকাযন্ত্র-বিশেষ। এ যন্ত্রেরও দোলক অনবরত দুলিতেছে, হৃৎপিণ্ডে অবিরত শব্দ হইতেছে। ঠিক এক নিয়মে তাহারও সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, অনিয়ম হইলেই যন্ত্র নষ্ট হয়। যাহাতে নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা যন্ত্রটী পরিষ্কৃত থাকে, তৎপক্ষে অবহিত থাকা উচিত।

বাস্তবিক, জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে পরিমিত ভোজন, সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন হইতে বিরতি, দুর্গন্ধপূরিত এবং অপরিষ্কৃত আহার্য্যের বর্জ্জন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত শারীরিক এবং মানসিক পরি-

শ্রম, নিয়মিত নিদ্রা, পরিষ্কৃত স্থানে এবং শুষ্ক ও পরিষ্কৃত গৃহে বাস প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, উপবেশন, স্নান ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক, এবং অধ্যয়ন, চিন্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানসিক পরিশ্রমের জন্য সময় নির্দ্ধারিত থাকা উচিত। এ সমস্তে ব্যতিক্রম ঘটাই শারীরিক এবং মানসিক অনিয়ম, এবং তাহাই স্বাস্থ্য-বিনাশের কারণ। যে খাদ্যে শরীরে বল হয়, অথচ আলস্য জন্মে না, শোণিত বৃদ্ধি করে, কিন্তু বৃথা মেদ বৃদ্ধি করে না, তাহাই আহার করা উচিত। যদি শরীরের উন্নতি সাধিত হয়, স্বাস্থ্য থাকে, তাহা হইলে মানসিক উন্নতিলাভ তত কঠিন হয় না। একটী ফলের বৃক্ষ ভালরূপে উৎপাদন, রক্ষণ, ও পরিবর্দ্ধনার্থ কোন স্থানের মৃত্তিকা ঐ বৃক্ষের উপযোগী, কোন বস্তু তাহার পক্ষে সার, কোন ঋতুতে তাহা রোপণ করা কর্ত্তব্য, কি পরিমাণের জল কোন সময়ে সেচন করা উচিত, এ সকল বিষয় পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার ফলানুসারে উপযুক্ত অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। মনুষ্যের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। দেহ ভাল না থাকিলে মানসিক-উন্নতি-ফল সুলভ নহে। শরীরের উন্নতি না হইলে মনের উন্নতি, দীর্ঘজীবন এবং সুখের আশা বৃথা।

একদা কোন যুবক একজন বৃদ্ধের সহিত কোন বড় লোককে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, একজন

খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ লোক জ্বালানি কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-গুলি সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত আছে। যুবক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?' বৃদ্ধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ খর্ব্বাকৃতি লোকটীকে দেখাইলেন। যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সেই লক্ষপতি!

বুদ্ধিমান বৃদ্ধ ধনী, যুবকের সে হাস্যের অর্থ তখনই বুঝিলেন, এবং নিজেও হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবু! আপনি মনে করিতেছেন, এ ব্যক্তির এই সামান্য বেশ, এ এই সামান্য কার্য্য করিতেছে, ইহারই আবার ধনী বলিয়া এত বড় নাম! কিন্তু আপনার বয়স অল্প, আপনি আজও সংসারে প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং আমাকে দেখিয়া আজ হাসিলেন; আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা শুনিলে বোধ হয় আর হাসিবেন না। আমাকে দেখিয়া বোধ হয় আপনি পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক মনে করেন নাই। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ৮০ বৎসর, পৌত্রের বয়স ৬০ বৎসর, প্রপৌত্রের ৪০ বৎসর, বৃদ্ধ-প্রপৌত্রের বয়স ২১ বৎসর, অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র এক বৎসর-বয়স্ক। আমি শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছি, তথাপি আমার দাঁত-গুলি নড়ে নাই, চুলও সব পাকে নাই। আমি প্রত্যূষে উঠি, মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করি, তৎপরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; আর সন্ধ্যা হইলে বিশ্রামের চেষ্টা

করি। আমি মাথায় বোঝা লইয়া, বিনা মূলধনে, বিনা-সম্বলে, বিনাসাহায্যে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ আমার মূলধন লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাল্যকালে যে ভাবে আহার, নিদ্রা, শয্যা, পরিধেয় প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম এখনও আমার ঠিক তাহাই আছে। আমার যে কখনও একটুকু শিরোবেদনা হইয়াছে তাহা মনে হয় না। অজীর্ণ, অনিদ্রা প্রভৃতি কথা লোকের মুখে শুনি মাত্র। আমি সারাদিন পরিশ্রম করি, যাহা আহার করি তাহাই ভাল লাগে, যেরূপ শয্যায় শয়ন করি তাহাতেই গাঢ় নিদ্রা হয়। কেবল একটুকু পরিচ্ছন্ন থাকা আমার চিরদিন অভ্যাস। আমার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। কিন্তু আমার পরিবারবর্গের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে আপনার দুঃখ বোধ হইবে। তাহারা আজ সকলেই বাবু,—রায় উপাধিধারী। তাহাদের পরিধেয় মূল্যবান, আহার্য্য উত্তম সামগ্রী, শয্যা একহস্ত পুরু; সুতরাং সকলেই ননীর পুতুল। ধনীর সন্তান,—শরীরে বাতাসের ভরও সয় না। তাহারা রুগ্ন, সুতরাং সর্ব্বদা বিষণ্ণ। অলস, অকর্ম্মণ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী; তাহারা একে একে সংসার হইতে প্রস্থান করিতেছে, আমি পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া আছি। আজ আমাকে যে কার্য্য করিতে দেখিয়া আপনি হাসিলেন, যখন অন্য কার্য্য না থাকে, তখন তাহাও করি, তথাপি অলসভাবে বসিয়া থাকি না।

কাজ মাত্রই কাজ, তাহাতে ছোট বড় নাই, ঘৃণার বিষয় নাই। আমি কালেজে পড়ি নাই, চাকর হইতেও উমেদাবী কবি নাই। যে চাকরী করে, সে পরের কার্য্য করে; পরের কার্য্যে মানাপমান থাকিতে পারে; নিজের কার্য্যে তাহা নাই। কেহ নিজের কোন কাজকে ঘৃণা করিলে, সে কার্য্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে, অন্যের হইবে; সে নিজে আর তাহা পাইবে না।'

এই মহাপুরুষের জীবন কি উপদেশ-পূর্ণ! এ কোন কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত ঘটনা। যে কেহ সামান্যাবস্থা হইতে বড়লোক হইয়াছে, তাহার জীবনই প্রায় এইরূপ। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল মানসিক পরিশ্রমকে জীবনের ব্রত না করিয়া সমস্ত জীবন নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করা এবং পরিশ্রম দ্বারা সমস্ত অঙ্গ দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। যে তাহা করিতে পারে, তাহার জীবনই মানবজীবন, উন্নত জীবন, সুখের জীবন।

এ কথা সত্য যে, মানব ঘটনার দাস। ঘটনাস্রোতে কাহাকে কোন পথে লইয়া যায় মানবের অনেক সময় সে সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং কাহারও জীবনে অধিকাংশ শারীরিক, আবার কাহারও জীবনে অধিকাংশ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। সেইরূপ মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রমের সময় বা সুযোগ অল্প। আফিসের বাঙ্গালী কেরাণী

তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল। মুন্সেফগণও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। কিন্তু তাঁহাদেরও ত প্রত্যুষে এবং প্রদোষে ভ্রমণ করিতে অধিকার আছে; অন্য কোন প্রকার অঙ্গসঞ্চালন সাধ্যায়ত্ত না হইলে কিয়ৎক্ষণ হাঁটিতে পারিলেও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে।

যেমন কোন সুখাদ্য বস্তু প্রতিনিয়ত আহার করিলে তাহাতে অরুচি জন্মে; যেমন কোন সুমধুর সঙ্গীত সর্ব্বদা শুনিতে শুনিতে তাহা আর শ্রুতিসুখকর থাকে না; যেমন লাভজনক একটী শস্য প্রতিবৎসর এক ক্ষেত্রে অর্জ্জনের চেষ্টা করিলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়; যেমন একরূপ আমোদ প্রতিদিন অনুসৃত হইলে তাহার মনোমোহন-শক্তি থাকে না;—পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন;—তেমনই, মানসিক পরিশ্রম নিতান্ত সুখকর হইলেও তাহা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠানদ্বারা অপ্রীতিকর এবং শরীরের পক্ষে অনিষ্টজনক হইয়া পড়ে। যদি সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম থাকে, তাহা হইলে মন অবসন্ন হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিবে, অনেক ছাত্রের এই একমাত্র চেষ্টা। এইরূপ চেষ্টাদ্বারা তাহারা যে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার করিতেছে, তাহা কি ছাত্রগণ বা তাহাদের অন্ধ অভি-

ভাবকগণ একবার ভাবিয়া দেখেন? যে বিদ্যায় কিছু দিন সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ না হয়, সে বিদ্যালাভের প্রয়োজন কি? আমরা প্রতিদিন পাশ্চাত্য, ঈশ্বরানুগৃহীত জাতিগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে বাসনা প্রকাশ করি। কিন্তু তাহাদের শারীরিক অবস্থা, সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম-ক্ষমতা কত উৎকৃষ্ট ও অধিক তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না।

দুর্ব্বলের অশেষ দোষ। দুর্ব্বল, রুগ্ন, কৃশকায় ব্যক্তি সাধারণতঃ ভীরু, বিষণ্ণ এবং অনেক সময় কুটিল; কিন্তু সবল সুস্থ ও পূর্ণায়তন ব্যক্তি সাধারণতঃ সরল, প্রফুল্ল ও সাহসী। সুতরাং শিক্ষার প্রথম অঙ্গ শারীরিক শিক্ষা এবং শরীরের উন্নতি সাধন।

(খ)

মানসিক শিক্ষা।

শারীরিকশিক্ষা যেমন সরল ও সহজ, মানসিকশিক্ষা তেমন নহে। এ শিক্ষা বহু-বিস্তৃত। ইহার আদি নির্ণয় সহজ নয়, শেষ নির্ণয় অসাধ্য। কোন দিন শিক্ষা আরম্ভ হয় কে বলিবে? শিশুর শিক্ষারম্ভের সময় তাহার স্মৃতির অতীত। কোন দিন তাহার নেত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়গুলি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল কে বলিবে? কোন দিন মনে ধারণা জন্মিবার সূচনা হইল কে অবধারণ করিবে?

মানসিকশিক্ষার প্রথমে প্রকৃতি-অধ্যয়ন; তৎপর গ্রন্থ-অধ্যয়ন। গ্রন্থসমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী মানবগণের জ্ঞানসমষ্টি। গ্রন্থের পরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ব্যবসায়শিক্ষা, এবং ব্যবসায়শিক্ষা হইলে সামাজিক এবং পারিবারিক-শিক্ষা—স্নেহ, মমতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অর্জ্জন ও উন্নতি সাধন।

(১)

প্রকৃতি অধ্যয়ন।

ছোট বড় সকলেই সর্ব্বদা প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতেছে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলেই করিবে। নেত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় কাহারও নিষ্ক্রিয় নহে; সুতরাং জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়া হউক, প্রকৃতি অধ্যয়ন সংসারে প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

কালে কালে মনুষ্যের মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, গ্রন্থাধ্যয়নলিপ্সাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার লোকের আপন মনীষায়, আপন প্রতিভায়,—কেবল আপনার নহে, সমসাময়িক প্রায় সকলের মানসিক শক্তি সম্বন্ধেই আস্থা কমিয়া যাইতেছে। প্রাচীন মনীষিগণের দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলে কেহই এখন নূতন কথা, নূতন মত বিশ্বাস করিতে চায় না। কোন আবিষ্কার যত অভিনব হউক না কেন, পূর্ব্বেও যে সেরূপ কিছু পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রায় সকলেই সচেষ্ট। বর্ত্তমান যুগের উপর এইরূপ একটী অনাস্থা, অবিশ্বাস জন্মিতেছে, এবং সে সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। নূতন-মত-প্রকাশক ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় হইলে তাঁহার কতক সম্মান থাকিতে পারে,

কিন্তু তিনি স্বদেশীয়, স্বজাতীয়, বিশেষতঃ পরিচিত ব্যক্তি হইলে, কিরূপে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিব, কিরূপে তাঁহাকে উড়াইয়া দিব, ইহা সকলেরই চেষ্টার বিষয় হয়। দূরের সকলই সুন্দর। অতীত কালের কোন ব্যক্তিকে সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা কেবল তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা দেখিতে বা লক্ষ্য করিতে সুযোগ পাই না। কিন্তু নিকটস্থ ব্যক্তির চরিত্র এবং তাহার দুর্ব্বল অংশ আমাদের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়। সংসারে গুণগ্রাহীর সংখ্যা অল্প, দোষ-সমালোচক অনেক অধিক, সুতরাং আমারা দোষকে বড় এবং গুণকে ছোট করিয়া লই। এই জন্যই সমসাময়িক ব্যক্তির সম্মান অল্প, অতীত কালের তত্তুল্য মনুষ্যেরও সম্মান অনেক অধিক। আজ যদি আমরা সকল দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ সকলকে একত্র আমাদের মধ্যে বিরাজমান দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহার কত জনকে যে উচ্চ-সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া আমাদের সমান আসনে স্থান লইতে হইত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা বর্ত্তমানের প্রতি এমনই বিদ্বেষী এবং অতীতের প্রতি এমনই আস্থাবান। কেবল এইজন্য যুগে যুগে গ্রন্থের সম্মান বাড়িয়া চলিয়াছে, আর আমরা নিত্য বিরাজমানা, জীবিতা এবং জীবন-

দায়িনী প্রকৃতি দেবীকে ভুলিয়া গিয়া সুদূরবর্ত্তী সময়ের মৃত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মৃত গ্রন্থাবলীর অনুশীলনে এত অনুরক্ত হইয়াছি।

আজ সংসারে যেখানে যে কোন শাস্ত্র অধীত হইতেছে, সে সমস্ত কি ঈশ্বর আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন? তাহা কি মনুষ্য কর্ত্তৃক লিখিত এবং সংগৃহীত নহে? মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল, খগোল, গণিত, সঙ্গীত, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই কি মানবের প্রকৃতি-অধ্যয়নের ফল নহে? মনুষ্য সমস্ত বিদ্যা লইয়া সংসারে আইসে নাই; কত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া উপরি লিখিত এক একটী বিষয়ের অনুশীলন করা হইয়াছে, কত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছেন. আজও উহার কোন একটী শাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন সহস্র সহস্র স্রোতস্বতী অনবরতঃ এক মহাসাগরে বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু মহার্ণব পূর্ণ হইতেছে না, কখনও পূর্ণ হইবে না; তেমনই শতসহস্র যুগের মস্তিষ্ক-নিঃসৃত জ্ঞানরাশি এক এক শাস্ত্রে ঢালা হইতেছে; অথচ সে মহাসমুদ্র পূর্ণ হইতেছে না। আজ যে মত অভ্রান্ত, কাল তাহার ভ্রম বাহির হইতেছে। অন্ধকারময়ী রজনীতে দিক্-

ভ্রান্ত মানবের দিঙ্‌নির্ণয়ার্থ অনন্ত প্রকৃতি ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় - বিরাজমানা, অন্ধকারে ভীত না হইয়া, সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরার বিলীন প্রায় পাদ-চিহ্নযুক্ত, কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন না করিয়া, যে ঐ নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে, এবং সাহসের সহিত আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইতে জানে, সে কখনও বিপথগামী হয় না, নিশ্চয় নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারে। সেই সাহসী পুরুষই প্রকৃত মানব এবং প্রকৃত সমালোচক।

ঐ না লক্ষ লক্ষ গ্রন্থকার রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়া ইয়োরোপের পুস্তকালয় সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেদিনও নির্ভীকহৃদয়, স্বাধীনচেতা দারবিন্‌ সাহেব নূতন প্রণালীতে নূতন বিজ্ঞান প্রণয়ন করিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল অংশ ভ্রমণ করিয়া, প্রাণিজগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া, জগতের ক্রমোন্নতি,—ইতর প্রাণী হইতে ক্রমোন্নতির নিয়মে মনুষ্যের আবির্ভাব, প্রতিপাদন করিয়া আপন প্রতিভাতেজে, জ্ঞানগৌরবে, বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপ মহাদেশকে স্তম্ভিত করিয়াছেন; উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিবর্গের জন্ম, বিস্তার, রূপান্তর এবং ধ্বংসের ইতিহাস লিখিয়া মনুষ্যের মনের গূঢ়তম ভাব তাহার বাহ্য আকারে কিরূপে প্রতিভাত হয়, তৎসমস্ত সুন্দররূপে বিবৃত করিয়া, প্রকৃতি-গ্রন্থ পাঠে যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন,

তাহার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতি-পাঠে চিন্তাশীল মানব যে কত বড় হয়, মহাপণ্ডিত দারবিন্ তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইয়োরোপে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রকৃতির পরিদর্শন ও অনুশীলনের ফল। আবিষ্কর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ লেখা পড়াও জানিতেন না; তাঁহারা পুস্তকঅধ্যয়নদ্বারা পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানের সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই। ফরাশি দেশের কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যদি আপনাকে জানিতে চাও, তবে অন্য মনুষ্য অধ্যয়ন কর; আর যদি অন্যকে জানিতে চাও, তবে আপনাকে অধ্যয়ন কর।" এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া অনেক বিষয়ে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা অসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রকৃতি পাঠ করিতে হইলে পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষা প্রধান সহায়। কেহ তাহার সাহায্যে পাঠ সমাপ্ত করিতেছে; কেহ আবার এখনকার ছাত্র-দিগের পরীক্ষার্থ নির্দ্ধারিত সাহিত্যের অর্থপুস্তকের ন্যায়, পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানভাণ্ডাররূপ গ্রন্থাবলীর সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের মূলসত্য উদ্ভাবন দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতার আজ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! বারুদ প্রস্তুত করিবার উপায় ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা দিয়া চীনদেশীয়গণ সমরশাস্ত্রে কি যুগান্তর উপ-

স্থিত করিয়াছে। দিগ্‌দর্শন, তাড়িত-বার্ত্তাবহ, তাড়িতের গুণ ও কার্য্য, মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা, সূতার কল, কাপড়ের কল, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, দূরশ্রবণ-যন্ত্র ও শব্দধারক যন্ত্র, যাহাই ভাবিয়া দেখ, চারি দিকে কেবল প্রকৃতিপর্য্যালোচনা ও প্রাকৃতিক কার্য্যের পরীক্ষার ফল দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে।

দুই ব্যক্তি একসঙ্গে একপথে চলিয়া যাইতেছে। একজন নিতান্ত উন্মনা ;—হয়ত কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে, অথবা কথোপকথনে ব্যাপৃত আছে। তাহার চক্ষুর সমক্ষে কোন বস্তু বা ব্যক্তি যে উপস্থিত ছিল, সে তাহা একবার লক্ষ্যও করে নাই। আবার, আর এক ব্যক্তির দৃষ্টি বাহ্যজগতে। সে পথের দুই পার্শ্বে যেখানে যে বৃক্ষলতা আছে, তাহা দেখিয়াছে, কোথায় কাহার বাসগৃহ তাহার নির্ণয় করিয়াছে ;—সে মুখে আলাপ করিলেও তাহার চক্ষু চক্ষুর কার্য্য এবং কর্ণ কর্ণের কার্য্য করিয়াছে। দূরে গেলে উভয়ের প্রতি এই পর্য্যবেক্ষণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অবাক্ হইবে, কিছুই বলিতে পারিবে না ; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত কথা যথাতথ বলিয়া দিবে। এ দুই জনের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, গ্রন্থবদ্ধদৃষ্টি, বাহ্যজগতে অন্ধ ছাত্র আর প্রকৃতির ছাত্রের মধ্যেও তাদৃশ পার্থক্য রহিয়াছে। অন্ধ যেমন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াও বৃক্ষ-

দেখিতে পায় না, চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া একটী নক্ষত্র বা চন্দ্রের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণে অনাসক্ত, পুস্তকে বদ্ধদৃষ্টি ছাত্রাদিগও তেমনই প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক পরিমাণে অনভিজ্ঞ থাকে।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনুষ্যই জগতের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি; প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকেই পাঠ করিবে। যেমন সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তেমনই মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। মানবমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের বিষয়। যদি একবার মনুষ্যের মন অতি সাবধানে অধ্যয়ন করিতে পার, শুদ্ধ অধ্যয়ন নহে, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার জানিবার অনেক বিষয় অতি সহজে তোমার জানা হইল;—কারণ মানবমন জগতের অনুকৃতি মাত্র। মানবমনের ইতিহাস মনোবিজ্ঞান; মানসিক গুণনিচয়ের ইতিহাস নীতিশাস্ত্র। মানবমনের ভাবপ্রকাশ ভাষা-বিজ্ঞান, গণনানিচয় গণিতবিজ্ঞান; তাহার কার্য্যকলাপ ইতিহাস। মানবমন অনন্ত রত্নের আকর। তাহার প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কথা শত শত জীবিতগ্রন্থ। সেই সজীব গ্রন্থ উপেক্ষা করিয়া অন্ধ মানব নির্জীব গ্রন্থনিচয় কীটের ন্যায় উদরসাৎ করিতেছে; অথচ

তাহার কোন অংশে কি আছে তাহাও বাছিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না!

মানবদেহও সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহাতে নিহিত। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের-প্রণেতা, তাঁহারা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মানবের মৃত দেহ, জীবিত দেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। এক জাতির পর অন্য জাতি, এক বংশের পর অন্য বংশ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার বিরাম হয় নাই। আজও পরীক্ষা চলিতেছে, আরও কোটি কল্প ব্যাপিয়া চলিবে; চিকিৎসাশাস্ত্র যে কখন অভ্রান্ত ও পূর্ণায়ত হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রকৃতি-গ্রন্থ এমনই অনন্ত যে, ইহা কখনও সমাপ্ত করা যাইতে পারে না।

মনুষ্যের গঠন-বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য, মানসিক বৈচিত্র্য, আবার সেই বৈষম্যেও এক অভাবনীয় সাদৃশ্য সামান্য অনুশীলনের বিষয় নহে। ক্ষুদ্র মানবজীবন তাহার একটীরও অনুশীলন সুসম্পন্ন করিতে পারে না।

প্রাণিজগতে প্রাণী অসংখ্য। জলে তিমি, স্থলে হস্তী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত কোটি কোটি প্রাণী বর্ত্তমান আছে। ইহার সমস্তগুলির পর্য্যা-লোচনা ও পরীক্ষা এবং তাহার গুণ শিক্ষা করা বহু-দূরের কথা, একজীবনে তাহার সহস্রাংশের একাংশও

হয় না। যখন কত প্রকার প্রাণী আছে আজ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইতে পারে নাই, তখন কোন প্রাণীর শারীর-ধর্ম্ম কিরূপ, কাহার কি গুণ, তাহা অবধারণ করা কাহার সাধ্য ?

সমুদ্র জলরাশি। জলের সাধারণ গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার বাহিরে যে তরঙ্গ, ফেনা, বুদ্‌বুদ্‌, স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় কেবল তাহাই সমুদ্রের ধর্ম্ম। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, শত শত নদী অহোরাত্র সুমিষ্ট বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু তাহাতেও সে লবণত্ব দূর হয় না, কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ মাত্র স্থল। স্থলভাগ আমরা সহজে দেখিতে পারি। অথচ তাহাতে কতরূপ প্রাণী আছে এ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইল না। অন্য প্রাণী দূরে থাকুক, কত প্রকার মনুষ্য আছে আমরা তাহাও ঠিক জানি না। সে দিন একজন ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী মধ্য আফ্রিকায় একজাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাদের পূর্ণায়ত পুরুষের শরীরও দৈর্ঘ্যে তিন ফুট অর্থাৎ এক গজের অধিক নহে! আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমামধ্যস্থ অধিষ্ঠানভূমি-ভাগেই যখন এত অজ্ঞতা, তখন সমুদ্র মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সহস্র সহস্র জীবন এই সমুদয়ের অনুশীলনার্থ অতিবাহিত

হইয়াছে; আরও সহস্র সহস্র জীবন এইরূপে অতি-বাহিত হইবে। সেই অনুশীলনের ফলে জগতের কত উন্নতি সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি মনুষ্যে অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভের বহুমূল্য মুক্তা, সুন্দর সুন্দর প্রস্তর, প্রবাল, প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু কখনও আমাদের জ্ঞানগোচর হইত না। সমুদ্রের জল ও বালুকা হইতে লবণ প্রস্তুত হয়; লবণ মনুষ্যের জীবনরক্ষার এক প্রধান উপাদান; লবণ ব্যবহার না করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। অনুসন্ধান ও পরীক্ষা না থাকিলে এই লবণের গুণ বা অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোকে জানিত না। কে জানে সমুদ্রগর্ভে কোন অংশে কোন মহাবস্তু লুক্কায়িত আছে! এখন সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা নির্ণীত হইয়াছে। কোনস্থলে জলের নীচে গুপ্ত পর্ব্বত, কোনস্থলে চুম্বকের আকর, কোনস্থলে প্রবাল বা স্পঞ্জের বৃক্ষাকার ও স্তূপাকার অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন স্থলে জলের গভীরতা আজও নির্ণীত হয় নাই, অতলস্পর্শ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সে সমস্ত স্থানে জাহাজ লইয়া গমনাগমন বিপজ্জনক। সুতরাং বাণিজ্যব্যবসায়িগণ এবং নাবিক-গণ জলপথের চিহ্ন করিয়া লইয়াছে। এইরূপে ক্রমে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বলে মানব অপরিজ্ঞাত সমুদ্র সম্বন্ধেও বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে।

কথিত আছে, জলে সফরীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্য নৌকা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে; সফরীর পুচ্ছ নৌকার কর্ণ, তাহার ডানা নৌকার দাঁড়। মৎস্যের সন্তরণ দেখিয়া বা পক্ষীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানুষ সাঁতার দিতে শিখিয়াছে। মনুষ্য জগতের পরীক্ষক। পক্ষী কোন ফলে চঞ্চু ব্যবহার করিয়াছে, কোন ফলে করে নাই তাহা দেখিয়া সে অপরিজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত ফল, খাদ্য কি অখাদ্য তাহা নির্ণয় করিতেছে। কতকগুলি পতঙ্গ উড়িতেছে অথবা ভেক ডাকিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে বৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহারা ওরূপ করে; সুতরাং মনুষ্য বুঝিয়া লইল বৃষ্টি নিকট। কুক্কুরের ক্রন্দন, শৃগালের নীরবতা, বায়সের স্বরবিশেষ লক্ষ্য করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধি স্থির করিতে পারে মড়ক সমাসন্ন। পরিদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা এইরূপে কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় এবং কার্য্য হইতে কারণ ও কারণ হইতে কার্য্য স্থির করিতে না পারিলে সংসারে মনুষ্যের অবস্থা অনেক ইতর প্রাণী অপেক্ষাও হীন হইত।

উদ্ভিজ্জ জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সৃষ্টির এই অংশ প্রাণিজগৎ অপেক্ষাও বিস্তৃত। উদ্ভিজ্জ প্রাণিজগতের খাদ্য, ঔষধ, ব্যবহার-সামগ্রী ও বিলাস-সামগ্রী। তোমার বাড়ীর সম্মুখে ঐ যে একটী অশ্বত্থ

বৃক্ষ অটল, অচলভাবে দণ্ডায়মান আছে, একবার ভাবিয়া দেখ, কত ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত উহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ সহিষ্ণু বৃক্ষবর তথাপি স্থির-ভাবে আছে। তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সংসার হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, অশ্বত্থ বৃক্ষটী যেমন তেমনই আছে। তাহার গতি নীচ নহে, নিম্নদিকে একবারও যায় না, ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। শীতে পত্রপল্লববিহীন হইয়াও নিরাশ, নিরুৎসাহ নহে, বসন্তের কোমলস্পর্শে পুনরায় পত্রপল্লবে সুসজ্জিত হইতেছে। একবার মূল হইতে পত্র পর্য্যন্ত যথাতথ পরীক্ষা কর ;— তোমার কত বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। উদ্ভিদ্ অনন্ত, তাহার একটীর পরীক্ষাই যখন এত কঠিন, তখন সমস্ত পরীক্ষা করা সসীম মানবজীবনের কার্য্য নহে।

এ কথা যথার্থ যে সম্যক্ পরীক্ষা করা অসাধ্য, কিন্তু তথাপি পরীক্ষা করা মানবজীবনের একটী কর্ত্তব্য। উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি তীক্ষ্ণবিষ, রক্তে মিশ্রিত হইলেই প্রাণ যায়। কোনটী লঘুবিষ, ধীরে ধীরে প্রাণ-বায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়; কোনটী স্পষ্ট প্রাণ নাশক নয়, শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু তথাপি বিষ ত্যাজ্য বা অব্যবহার্য্য নহে। ভাল শরীরে যাহা প্রাণনাশক, রুগ্ন শরীরে তাহাই আবার প্রাণরক্ষক। যাহা বিষ নহে তাহার মধ্যে কতক সুস্বাদু খাদ্য, কতক

তিক্ত, কটু, কষায় বলিয়া অখাদ্য, আবার তাহাও অবস্থা বিশেষে ঔষধ। দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা কতকগুলি সুখাদ্য ও শরীরপোষকরূপে ব্যবহৃত, অন্য-গুলি অখাদ্য ও শরীরনাশকরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। কালে কালে নূতন নূতন শাকসবুজি, নূতন নূতন উদ্ভিদ, নূতন নূতন প্রণালীতে খাদ্য বস্তুর তালিকাভুক্ত হই-তেছে ;—কোনটী উপকারী, কোনটী অপকারী তাহাও নির্ণীত হইতেছে। সংসারে যত প্রকার রোগ আছে তাহার ঔষধ উদ্ভিজ্জ জগতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনুষ্য পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলে সে সমস্ত রোগের ভীষণত্ব আর থাকিবে না। পূর্ব্বে বসন্ত-রোগে অতি অল্প সংখ্যক রক্ষা পাইত, এখন অতি অল্প সংখ্যক মরে। চিকিৎসাশাস্ত্র আরও উন্নত হইলে ঐ সকল রোগের ভীষণত্ব আরও কমিবে। প্রকৃতির এমনই অব্যর্থ নিয়ম যে, যেখানে আপনা হইতে বিষবৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহার নিকটেই আবার বিষঘ্ন বৃক্ষও রহিয়াছে। যে দেশে নূতন রোগ আছে, সেই দেশেই আবার তাহার নূতন ঔষধ আছে। ওলাউঠা, লাল জ্বর, কালা জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা শতবর্ষ পূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল, অথচ এসমস্ত এক্ষণে পৃথিবীতে লোমহর্ষণ আধিপত্য বিস্তার করি-তেছে। আবার প্রকৃতিও এমনই সতর্ক যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিজ্জের সৃষ্টিবিস্তার করিয়া সেই সমস্ত

নূতন রোগের নূতন ঔষধ বিধান করিতেছেন। স্নেহময়ী জননী যেমন সুপ্তশিশুর শরীর মশ-কাদির দংশন হইতে রক্ষাকরণার্থ অনবরত অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করেন, শিশু তাহা বুঝিতেও পারে না; স্নেহময়ী প্রকৃতিদেবী তেমনই ভাবে সৃষ্টিরাজ্যে নিরা-শ্রয় প্রাণিসমুদয়কে রক্ষা করিতেছেন, তাহারা তাহা জানিতেও পারিতেছে না। সুতরাং আহার্য্য-নির্ণয়ে বা ঔষধ-আবিষ্কারে, ব্যবহার্য্য বস্তুর নির্ম্মাণে বা বিলাস-সাধনে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, উদ্ভিজ্জজগৎ পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষা করা,—প্রকৃতি-গ্রন্থের অতীব প্রয়ো-জনীয় এই অধ্যায়টী অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা,—মানব-জীবনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভূগর্ভে কত রত্ন নিহিত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? যে সকল ধাতু, লবণ, চূর্ণ, কয়লা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য খনিজ বস্তু আকর হইতে সর্ব্বদা উত্তোলিত হইতেছে, কেবল সেই পরিজ্ঞাত বস্তু কয়টী পরীক্ষা করিতে কত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং হইবে। কালে কালে আরও কত হইবে কে জানে। পূর্ব্বে পঞ্চভূতের রাজত্ব ছিল; এখন শতাধিক ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিজ বস্তুও ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িতেছে। আবার প্রকৃত বস্তুর অনুকরণে কৃত্রিম বস্তুও প্রস্তুত হইতেছে। কাচ হইতে

কৃত্রিম মুক্তা, কয়লা হইতে কৃত্রিম হীরক, বাহির হইয়াছে। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুও কৃত্রিম করা হইতেছে। রাসায়নিক বলে কৃত্রিম ধাতু প্রকৃত ধাতুর ন্যায় চলিতেছে। প্রকৃত বস্তুই পরীক্ষা কর, আর অনুকরণে কৃত্রিম বস্তুই প্রস্তুত কর, তোমার জীবনের সমস্ত কার্য্য প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ। এ বিভাগে প্রকৃতি তোমার মানসিক শিক্ষার জন্য অশেষবিধ নূতন বিষয় প্রদান করিয়াছে।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর। শূন্যমার্গেও প্রকৃতি তোমার শিক্ষাদাত্রী। উন্নত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তোমার মনকে উন্নত ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত অনেক কথা বলিতে পারিবে। ঐ সমস্ত অত্যুন্নত অধ্যাপকগণ তোমার শত পুরুষ পূর্ব্বে শিক্ষাদান আরম্ভ করিয়াছেন, শতপুরুষ পরেও শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার ফুরাইবে না। তাঁহাদের প্রকৃতি, গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে সুকঠিন জ্যোতিষশাস্ত্র ;—সহস্র যুগ চলিয়া গেল আজও জ্যোতিষ পূর্ণাঙ্গ হইল না। এক যুগে একরূপ অনুমিত হয়, তাহার পরের যুগে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। প্রকৃতির এই উন্নত অংশ সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। এখানেও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

যত প্রকার কল কৌশল মানবজ্ঞানের বিষয়ীভূত,

সে সমস্তই প্রকৃতি পরিদর্শনের ফল। হয় তুমি নিজে করিয়াছ, না হয় তোমার পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় তাহা তোমার জন্য সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষা প্রকৃতিলব্ধ। চক্রদণ্ডাদি যন্ত্র-বলগুলি প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত। হস্তপদাদি যে যথেচ্ছাক্রমে সঞ্চালন বা প্রসারণ করা যায়, তদ্দৃষ্টে কি সূত্রধরের এবং কর্ম্মকারের গ্রন্থিসংযোগ শিক্ষা হয় নাই? আজ মনুষ্যচেষ্টাতে শ্রম লাঘবের অনেক কৌশল দেখিতেছি, অনেক সুখসেব্য বিলাসবস্তু লাভ করিতেছি ;—প্রকৃতি কি সে সমস্তের মূলতত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দেন নাই? যে ব্যক্তি প্রকৃতি-পরিদর্শনে অন্ধ, সে ঘোর মূর্খ।

অতএব স্বাধীনভাবে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবল পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, জীবনের প্রথম হইতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। প্রকৃতির কঠিন তত্ত্ব সমস্ত মীমাংসা করিতে হইবে ; তাহা হইলেই অন্বয়ী মুখে হউক, ব্যতিরেক মুখে হউক স্থির উপপত্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। পুস্তক কখনও বুদ্ধি দিতে পারে না, চিন্তাশক্তি দিতে পারে না, কিন্তু উভয়ের বিকাশপক্ষে সাহায্য করে। প্রকৃতি উভয়ই প্রদান করে। গ্রন্থশিক্ষা প্রকৃতিশিক্ষার ধাত্রী-স্বরূপ। তুমি প্রকৃতিশিক্ষা হইতে আপন মনের বস্ত্রা-লঙ্কার সংগ্রহ করিলে, গ্রন্থশিক্ষা কেবল আপন মার্জ্জিত

রুচি, অভিজ্ঞতা ও সভ্যতার গুণে সে সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারে। অতএব যদি বড় লোক হইতে চাও, তবে শৈশব হইতে সাবধানে সৎপথে থাকিয়া প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন কর, তোমার আশা ও উদ্দেশ্য সফল হইবে, তুমি যশস্বী, স্মরণীয় এবং সত্যসত্যই একজন অতি প্রধান লোক হইতে পারিবে; তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

(২)

গ্রন্থ শিক্ষা।

প্রকৃতিশিক্ষার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, শীত, গ্রীষ্মাদির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আছে; যাহার যতদূর অনুধাবন, তৎসম্বন্ধে সে সেই পরিমাণে মত প্রকাশ করে। কিন্তু যে শিক্ষা যেখানে অধিক পরিমাণে আলোচিত ও অনুসৃত তাহাই সহজ, আর যাহার আলোচনা অল্প তাহা সহজ হইলেও কঠিন। গ্রন্থশিক্ষার বহুল প্রচার-বশতঃ অন্যের সাহায্যে দেখিতে আমাদের এরূপ অভ্যাস হইয়াছে যে, তাহাই আমাদের নিকট সহজ; আর আপনার চক্ষু খুলিলে যাহা দেখিব, অভ্যাস-বৈগুণ্যে স্বাবলম্বনভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া আমাদের নিকট তাহাই,—সেই প্রকৃতিলব্ধ শিক্ষাই—কঠিন।

কোন সময়ে লেখাপড়ার আরম্ভ, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ক খ বা অ আ প্রভৃতির জন্মপত্রিকা নাই, ১, ২, প্রভৃতির জন্মদিনও আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা এতকাল অনুসন্ধানের পর এই মাত্র বুঝিয়াছি যে,ভারতবর্ষে ঐ সমস্তের জন্ম, আর্য্যজাতিই তাহাদের জনক। এই লেখাপড়ার ফল অতিচমৎকার। অক্ষর ভাষার মূলদেশ; অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সাকার হইল, তৎ-

পূর্ব্বে নিরাকার ছিল। ভাষা গঠিত হইলে তৎসঙ্গে লেখাপড়ার আরম্ভ। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সভ্য জনপদসমূহেও বাক্যসমূহ হস্তলিখিত এবং পরিশেষে অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তরে ক্ষোদিত হইত। প্রথমে কাগজ পর্য্যন্ত ছিল না। তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র, কাগজের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। লেখনী বংশখণ্ড এবং লৌহ। জ্ঞাতব্যবিষয় মুখস্থ করিয়া রাখা শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি ছিল। সুতরাং শ্রুতি শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইত, স্মৃতি স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখা যাইত। অন্য সহজ উপায় না থাকাতে স্মৃতিশক্তি বিলক্ষণ প্রখরতা লাভ করিত। সমগ্র বেদ,সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক মহর্ষি,অনেক অধ্যাপক কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপনের যোগ্য, শিক্ষার উপযুক্ত সমস্ত বিষয় যাঁহার কণ্ঠস্থ, যিনি স্বাধীন চিন্তায়, প্রকৃতি অধ্যয়নে গৌরবপূর্ণ, তিনি যে কত বড় গুরু, তাহা সহজে ধারণা হয় না। সুতরাং তখনকার গুরুও গুরু ছিলেন, শিষ্যও শিষ্য ছিলেন।

সে সময়ে শিষ্যকে বড় কঠোর নিয়মে গুরুর অধীন থাকিতে হইত। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের জন্য দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা না জন্মিত, যে পর্য্যন্ত আপন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয়দানে শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তি গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিত, সে পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইত। ক্রমে, গুরুর জ্ঞানে, চরিত্রে, ঔদার্য্যে এবং

গুরুত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিত, আকাঙ্ক্ষার তেজে উত্তপ্ত হৃদয়-ভূমিতে গুরু উপদেশবারি বিতরণ করিতেন, শিষ্য-হৃদয় আগ্রহের সহিত তাহা পান করিত, কাজেই অতি অল্প সময়ে জ্ঞানতরুর বিকাশ হইয়া সুফল ফলিত।

গুরু সর্ব্বপ্রথমে বশ্যতা শিখাইতেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট নত হইতে জানে, সে যেখানে গৌরব, যেখানে মহত্ত্ব সেখানেই নম্র এবং বিনয়ী। ক্রমে বিনয় তাহার ভূষণ হয়। তাহার পক্ষে বড় হইতে অনেক দিন লাগে না। গুরু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তৎপর আপন দৃষ্টান্ত এবং অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতিশিক্ষা দিতেন, এবং জ্ঞানশিক্ষায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই শিষ্যের চরিত্র ধীরে ধীরে গঠন করিয়া তুলিতেন। পরে, গঠিত চরিত্রে, কর্ষিত ক্ষেত্রে গুরু যে জ্ঞানবীজ বপন করিতেন, তাহাই সুফল প্রসব করিত।

শিষ্য গুরুর কিরূপ বাধ্য ছিল, অল্পবয়সে মাতা-পিতার নিকট হইতে নীত হইয়া কতদূর বশ্যতাস্বীকার-পূর্ব্বক গুরুর অধীন থাকিত, মহাভারতে তাহার অনেক-গুলি দৃষ্টান্ত আছে। উদ্দালক প্রভৃতি শিষ্যের বিবরণ উপদেশপরিপূর্ণ, এবং ছাত্রজীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। এস্থলে তৎসমস্তের পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই হইবে যে চরিত্রবান্

এবং বিনয়ী হইতে পারিলে অনেক শিক্ষা হইল। নিষ্পাপমনে এবং নম্রভাবে, গুরুর গুরুত্বে দৃঢ় আস্থা রাখিয়া, ছাত্র যদি গ্রন্থ শিক্ষা আরম্ভ করে, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে অনেক অগ্রসর হইতে পারে। বিদ্যার্থে গুরু-শুশ্রূষা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্যই শাস্ত্র-কারেরা বলিয়াছেন, "হয় শুশ্রূষা দ্বারা, না হয় প্রচুর ধনদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিলে, কিম্বা এক বিদ্যা একজনকে দান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিদ্যান্তর গ্রহণ করিলে, বিদ্যালাভ হইতে পারে। ইহা ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার উপায়ান্তব নাই।"

গ্রন্থশিক্ষার প্রধান সহায় স্মৃতিশক্তি। মনোযোগে সে শক্তির উন্নতি, মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লিপ্ত রাখিলে তাহার অবনতি। স্মৃতি ও মনঃসংযোগে এত নিকট সম্বন্ধ যে, অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত উভয়কে একই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহারা বাস্তবিক এক নহে, পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। স্মৃতি ব্যতীত মন থাকিতে পারে না, মনঃসংযোগ না হইলে স্মৃতিও অকর্ম্মণ্য। যেমন ইন্ধন ব্যতীত অগ্নি জ্বলে না, অগ্নি না হইলে ইন্ধনও জ্বলে না, এও ঠিক সেইরূপ। গঠিত চরিত্রের মন ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না, যখন যে বিষয় অবলম্বন করে তাহাতেই দৃঢ় থাকে। সুতরাং স্মৃতিশক্তির উন্নতি লাভ করিতে হইলে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক।

বাল্যকালে অনেকের স্মৃতিশক্তি প্রখর দেখা যায়; কিন্তু বালক দুষ্টপ্রকৃতি ও অস্থির-মতি হইলে অতি অল্প দিনেই সে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। গ্রন্থ-শিক্ষা প্রদানের প্রথমেই মনঃসংযোগ শিক্ষাদান করা অভিভাবকের প্রথম কর্ত্তব্য। শিক্ষা একরূপ সাধনা; তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে হইলে সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডবগণকে শিক্ষাদানকালে অর্জ্জুনের মনঃসংযোগ পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষস্থিত একটী অতিক্ষুদ্র পক্ষীর মস্তক ব্যতীত তন্মুহূর্ত্তের জন্য অর্জ্জুনকে জগতের অন্য সর্ব্ববিধ বস্তুর সম্বন্ধে অন্ধবৎ দেখিয়া, কিরূপে সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আর এস্থলে বলিতে হইবে না; মহাভারতপাঠক সকলেই অবগত আছেন।

আজ তুমি একটী বালককে ক খ পড়াইতেছ, তোমার ক খ তাহার মনে স্থান পায় না। তাহার মা যে তাহার সাক্ষাতে কয়েকটী রসগোল্লা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহার মন সেখানে রহিয়াছে। মন একটী রবারের কলসী-স্বরূপ। তাহার গলদেশ অতি সঙ্কুচিত; যদি ভিতরে কিছু রাখিতে চাও, অল্প অল্প করিয়া ভরিতে থাক; ক্রমে যত দিবে ঐ কলসী সে সমস্তই ধারণ করিবে। কিন্তু শূন্যগর্ভ কলসীটির মুখে যদি অন্য কোন পাত্র এরূপ ভাবে রাখিয়া দাও যে, কলসীর মুখ

এসম্পূর্ণ আবৃত থাকে, আর তখন যদি তাহার উপর
নিজল ঢালিয়া দেও, তাহা হইলে ঐ জল বাহিরে পড়িয়া
রাযাইবে, কলসীর মধ্যে এক বিন্দুও প্রবেশ করিবে না।
অমনও তদ্রূপ। যদি বিষয়ান্তরের চিন্তা দ্বারা উহার মুখ বদ্ধ
গুরুর, আর তখন তোমার অধ্যাপক তোমার শিখিবার
কাবিষয়টী অতি সরল তরল করিয়াও উহার উপর ঢালিয়া
ধনদেন,তাহা হইলেও শিক্ষণীয় বিষয় মনে স্থান পাইবে না,
একতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া কোনও উপকারে আসিবে না।
কা যদি একটী বিষয়ে এক সময়ে মনঃসংযোগ করা
উপ্রথম হইতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে স্মৃতিশক্তি অতি
সহজে প্রখরতা লাভ করে। স্মৃতিশক্তির উন্নতি-সাধনের
সেইই একমাত্র উপায়। যদি তোমার শিখিবার বিষয় ভাল
তাশিখিতে চাও, সহজে শিক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে
সস্বাচ্চরিত্র ও বিনয়ী হইয়া গুরূপদেশে অবিভক্ত-মনঃসংযোগ
বলির। তাহা হইলে আর কোন কষ্ট হইবে না।
পর আমরা গ্রন্থশিক্ষা নাম দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ
পাকরিয়াছি। কিন্তু গ্রন্থ কি তাহা একবার বুঝা আবশ্যক।
যেমাহা গাঁথা হইয়াছে তাহা গ্রন্থ। গাঁথাও আবার দুই
ইপ্রকার। যাহা মালার ন্যায় গ্রথিত বা রচিত তাহাও
মনাথা ; আবার যাহা পুস্তকের ন্যায় সূত্রদ্বারা বাঁধা,
কতোহাও গাঁথা। গ্রন্থ বলিলে ইহার কোন অর্থই অসঙ্গত
উন্নয় না। যাহা কিছু ধারাবাহিকরূপে রচিত, তাহা গ্রন্থ,

আবার যাহা রচিত হইয়া পুস্তকাকারে গঠিত হইয়াছে তাহাও গ্রন্থ।

যেমন ফল মাত্রই স্বাদু নহে, ক্ষেত্রজ বস্তু মাত্রই শস্য নহে; সেইরূপ গ্রন্থ মাত্রই পাঠ্য নহে। ক্ষেত্রের আগাছা, ঘাস, কণ্টকাদি, ফলের বিস্বাদ অখাদ্য অংশগুলি যেমন ত্যাজ্য, লেখার মধ্যেও তেমনই অশ্লীল, ভ্রমদূষিত লেখা অবশ্য-পরিহার্য্য। জ্ঞানী শিক্ষক, পরিণামদর্শী অভিভাবক সতর্ক হইয়া দেখিবেন যে ছাত্র-জীবনে ঘৃণিত অপাঠ্য কোন পুস্তক নিকটে না থাকে, তরলমতি বালকের হস্তগত না হয়। যে সমস্ত খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যে সমস্ত ফল কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে, বালকেরা তাহা সহজে ভালবাসে না, অপক্ক আম্রও সহজলভ্য বলিয়া তাহাদের প্রিয়। সহজবোধ্য, সহজলভ্য, অপাঠ্য পুস্তকের সার-শূন্য কদর্য্য ভাবও তাহারা তেমনই প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবে; উপকারী সুপাঠ্য পুস্তক কঠিন বলিয়া দূরে রাখিবে।

শুদ্ধরূপে লিখিত সদুপদেশ এবং সৎশিক্ষাপ্রদ গ্রন্থই পাঠ্য, আর সমস্ত অপাঠ্য। সৎপুস্তক আপাততঃ নীরস বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা উপকারী। ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক তিক্তরস পান করিলে যেমন তাহা পিত্তাধিক্য নিবারণ এবং শরীরের উপকার সাধন

করে; তেমনই সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রথমে নীরস বোধ হইলেও তাহা অধ্যয়ন করিলে মনের উপকার হইবেই হইবে। আর তাহা তিক্তই বা লাগিবে কেন? নীরসই বা বোধ হইবে কেন? সরস নীরস কেবল শিক্ষকের গুণে বা দোষে হইয়া থাকে। কর্ত্তব্যপরায়ণ অধ্যাপক বা অভিভাবক স্বয়ং চরিত্রবান্ হইলে বালকের মনে সদুপদেশ রত্ন অতি সাবধানে যথাস্থানে বসাইতে এবং তদ্দ্বারা মন সুসজ্জিত করিতে পারেন। সুদক্ষ সূপকার আপনার রন্ধন-কৌশলে নিতান্ত নীরস এবং বিস্বাদ বস্তুও সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত করিতে পারে; সুকণ্ঠ গায়ক অতি কর্কশ সঙ্গীতটিকেও আপনার গুণে সুমধুর শুনাইতে পারেন; দক্ষ বাদকের হস্তে সামান্য যন্ত্রটিও সুমধুর ধ্বনিত হয়; সুদক্ষ অধ্যাপক ভাল বিষয় শিষ্যের নিকট ভাল বোধ করাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কেবল বিষয় ভাল হইলে চলিবে না, সাধুচরিত্র অধ্যাপক এবং উপদেষ্টার প্রয়োজন। কারণ সদ্দৃষ্টান্তের তুল্য বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই, অসৎ দৃষ্টান্তের ন্যায় শত্রুও আর নাই। সদ্দৃষ্টান্তে শত শত অসাধু লোক সাধু হইয়া গিয়াছে, আর অসদ্দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিতে করিতে কত সাধুচরিত্র ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এমন লোক সংসারে নাই যে, উল্লিখিত তথ্যের দুই চারিটী উদাহরণ দিতে অসমর্থ।

সৎ-পুস্তক যুগযুগান্তরের জ্ঞানসমষ্টি। এক একটি ভাল ঔষধে যেমন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বস্তুর সারাংশ নিহিত আছে; এক এক খানি ভাল গ্রন্থেও সেইরূপ শতশত যুগের লোক-মস্তিষ্কের সার-ভাগ সজ্জিত রহিয়াছে। লোক মরণশীল; ভাব অমর, ভাল পুস্তকও অমর। সদ্ভাব কখনও বিনষ্ট হয় না,—কথায়, কার্য্যে, গল্পে, পরিহাসে, কাব্যে, গানে, তাহা থাকিয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লোকে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল,এইরূপে আজ আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। আজ ব্যাস, বাল্মীকি,ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, কালিদাস, কপিল, গৌতম, কণাদ, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, বরাহ-মিহির, আর্য্যভট্ট, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, কবির আপন আপন মস্তিষ্ক দান করিয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কত যুগ ব্যাপিয়া ঐ সকল মহাপুরুষ নৈশশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ ভাবরত্ন ও জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন; আজ আমরা এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহা সুখে উপভোগ করিতেছি এবং অনেক সময়ে নিজে উপার্জ্জন-কষ্ট ভোগ করি নাই বলিয়া নির্ম্মম-ভাবে তাহার অপব্যয় করিতেছি! যাঁহারা কৃতী, তাঁহারা নিজ চেষ্টায় পৈত্রিক ধন বৃদ্ধি করেন; যাহারা মূর্খ ও অকৃতী, তাহারা তাহা পারে না।

প্রকৃতিলব্ধ শিক্ষাদ্বারা লোকের প্রতিভার প্রাখর্য্য দেখা যায়, তাহার মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায় সত্য; কিন্তু গ্রন্থশিক্ষা ব্যতীত মন মার্জ্জিত এবং গঠিত হয় না। দরিদ্র ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া অহোরাত্র পরিশ্রম-পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিলে প্রশংসার্হ হয় বটে; কিন্তু সে হঠাৎ তেমন বড়লোক হইতে পারে না। কিন্তু যাহার প্রচুর পৈত্রিক মূলধন আছে, সে যদি সাবধানে তদ্দ্বারা বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে অতি সহজে বড় ধনী হইতে পারে। তেমনই কেবল প্রকৃতিশিক্ষার বলে, গ্রন্থলব্ধ, পৈত্রিক জ্ঞানরত্নের মূলধন ব্যতীত কেহই বিদ্যা-বাণিজ্যে বড় ধনী হইতে পারে না। প্রকৃতি মনকে প্রস্তুত করে, গ্রন্থ তাহা মার্জ্জিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া দেয়। প্রাকৃতিক জ্ঞান আকরজাত অপরিষ্কৃত হীরক, গ্রন্থ তাহা কাটিয়া পরিষ্কৃত ও জ্যোতিষ্মান্ করে। স্বভাবশিক্ষা স্বভাবজ বনলতা; গ্রন্থশিক্ষা যত্নরক্ষিত উদ্যানলতা। স্বভাব-সৌন্দর্য্য মনোহর বটে; কিন্তু বসনভূষণে সুসজ্জিত হইলে আরও মনোহর হয়। যদি উদ্যানের যথাস্থানে যথাযোগ্য সমাবেশদ্বারা বনলতার স্বাভাবিক সজীবতা ও প্রফুল্লতা দেখাইতে পার, তাহা হইলে তুমি রুচির পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে। মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় কৃত্রিম ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের

সমাবেশ পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে। মনুষ্য অল্পায়ুঃ ও নিরাশ্রয় ; সুতরাং কোন ব্যক্তি মনীষিগণের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরত্নের মধ্য দিয়া সূত্র-স্বরূপ প্রবেশ করিতে পারিলে, সে আপনার জন্য যে সুন্দর মালা গাঁথিয়া লইতে পারিবে, এ সামান্য সীমাবদ্ধ নশ্বরজীবনে সে এত সময় পাইবে না যে, ততগুলি রত্ন অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিবে। তুমি স্বয়ং উপার্জ্জন কর, পরপ্রত্যাশী হইও না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তুমি পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত ধন উপভোগ করিবে না ? অথবা তুমি কি অলসভাবে বসিয়া কেবল সেই সঞ্চিত ধনই ভোগ করিবে, তাহার উন্নতি ও বৃদ্ধির উপায় দেখিবে না ? এ উভয়ই নিন্দনীয়। যে আপন চেষ্টায় স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করে, অথচ পৈত্রিক মূলধনও লাভজনকরূপে ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। সুতরাং স্বভাব হইতে যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া নিজের স্বাধীন-চিন্তা ও স্বাধীন-ক্ষমতা দেখাইবে, তেমনই আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণ-রচিত গ্রন্থাবলী হইতে জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিয়া আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী খনন করায় ও তাহার অভ্যন্তর হইতে বহু চেষ্টায় জল উদ্ধার করায়। কিন্তু সেই জল যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে দূষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে নালা কাটাইয়া পুষ্করিণীর

জল নদীর জলের সহিত সংযোগ করিয়া দিলে স্রোতের জল প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীর জল সংশোধন করে। তোমার মনোরূপ পুষ্করিণীতেও সেইরূপ আপন চেষ্টায় যত গভীর জ্ঞানবারি সঞ্চিত হউক না কেন, গ্রন্থরূপ নদীতে অনন্তকাল হইতে যে জ্ঞান-স্রোতঃ প্রবাহিত আছে, তাহা যদি উহার সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতি-লব্ধ জ্ঞানবারি দূষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্যই জ্ঞান-বিনিময়, এজন্যই বিদ্যাদানে বিদ্যার্জ্জন। সুতরাং গ্রন্থাধ্যয়ন ও গ্রন্থশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্ধভাবে কণ্ঠস্থ করার নাম গ্রন্থশিক্ষা নহে; টোলের পণ্ডিতগণ তাদৃশ পাঠকে আবৃত্তি মাত্র বলিতেন; তাঁহারা পড়া বলিলে পঠিত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণই বুঝিতেন। গ্রন্থশিক্ষা বলিলে সুপাঠ্য পুস্তকের মূল তাৎপর্য্য সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাহা আপন সম্পত্তি করিয়া লইয়া যখন যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারা, বুঝিতে হইবে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ছাত্র-জীবনে বিষয়-ভেদে রুচিভেদ, সুতরাং উৎকর্ষেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ সাহিত্যে পারদর্শী, গণিতে দুর্ব্বল; কেহ গণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন কিন্তু সাহিত্যে অমনো-যোগী। কেহ চিন্তাশীল, মনোবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক

বিজ্ঞান তাহার প্রিয়, আবার কেহ ইতিহাস লইয়া জীবন যাপন করিতে চায়। এ সমস্ত কাহারও পৈত্রিক স্বত্ব, বা বুদ্ধির পার্থক্যজনিত ফল নহে, কেবল মনঃসংযোগের তারতম্যের ফলমাত্র। বালকের মন চারিদিকে ধাবিত হইতে চায়; তখন কৌশল পূর্ব্বক তাহার মনে শিখিবার বাসনার উৎপাদন করা অভিভাবকের প্রধান কর্ত্তব্য। কখন কোন বিষয়ে মনোযোগের ত্রুটি হইল, বালক কোন বিষয় উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; তাহা প্রথম হইতে সাবধানে দেখিলে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিলে সকল বিষয়েই সুন্দররূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে;—গণিতে আমার বুদ্ধি নাই, সাহিত্যে রুচি নাই, বিজ্ঞান আমার জ্ঞানাতীত, এরূপ বলিবার কোন কারণ হয় না।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে সকল বিষয়ে সকলে সমান উৎকর্ষ লাভ করিবে। কিন্তু জীবনের প্রথম দিকে উপেক্ষার ভাব থাকিলে অনেক বিষয়ে মন মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, জ্ঞাতব্য প্রত্যেক বিষয়ের কিছু কিছু এবং একটী বিষয়ের প্রত্যেক অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করে। স্কুলবিভাগ ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ যখন কলেজে শিক্ষারম্ভ করে, তখন মধ্যে মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, গণিতের সরলাংশে যে ভাল ছিল, মিশ্র অংশ সে ধারণাও করিতে

পারে না। তখন বুঝিতে হইবে, গণিতে সে পারদর্শী হইবার নহে, সুতরাং তখন তাহার সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য বিষয়ান্তর মনোনীত করিতে হইবে। একটী বিষয় প্রধান অবলম্বন, ও অন্যান্য বিষয় কোন কার্য্যসাধনের সহায় করিয়া লইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা হয়।

আজ কাল আমরা অবস্থার অতীত অনেকগুলি অভাব এরূপ বাড়াইয়া লইয়াছি যে কিছুতেই সুখবোধ করি না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নও পরিত্যক্ত হয়। আমরা একবার জ্ঞান উপার্জ্জনের চেষ্টা করি; অধ্যাপক অনেক চেষ্টায় জ্ঞানের বোঝা আমাদের স্কন্ধে উঠাইয়া দেন, আমরা অনেক কষ্টে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে সে ভার নামাইয়া দেই, আর চিরজীবনের জন্য অবসর লইয়া অর্থচিন্তা করি। জ্ঞান-বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে জ্ঞান থাকিবে কেন? কথায় বলে বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। অতএব ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

জ্ঞান-বৃদ্ধির প্রথম উপায় জ্ঞান বিতরণ। অন্যকে উপদেশ প্রদান দ্বারা যে পরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, অধীত বিষয় ভাল মনে থাকে, আলোচনা দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অন্যবস্তু

বিতরণ দ্বারা ক্ষয় পায়, কিন্তু জ্ঞান বাড়িয়া চলে। কে না জানে, গুরুর শাস্ত্রোপদেশ, বাগ্মীর বক্তৃতা, ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ কেবল শিষ্য ও শ্রোতৃবর্গের উন্নতি-সাধন করিয়া বিরত হয় না, গুরু, বাগ্মী ও ধর্ম্মোপদেষ্টার বরং অধিক উপকার করে। লজ্জা পাইবার আশঙ্কা ও যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা এত অধিক, এমনই প্রবল যে, যত্ন ও চেষ্টা অনেক অধিক হয়, স্মরণ রাখিবার আগ্রহ অনেক বাড়িয়া চলে; সুতরাং গুরুর জ্ঞান মার্জ্জিত, বাগ্মীর বক্তৃতাশক্তি উদ্দীপ্ত এবং ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মভাব প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

এ কেবল বাচনিক উপদেশের কথা। লিখিত উপদেশ, গ্রন্থ-প্রণয়নদ্বারা জ্ঞানবিতরণ, উপদেষ্টার আরও অধিক উপকারী। বলিতে অধিক সাবধান না হইলেও চলিতে পারে; বাগ্মীর ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রোতৃবর্গ তাঁহার ভাষা বা ভাবের দোষগুণ সমালোচনার সুযোগ পায় না; কিন্তু লিখিত বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া সমালোচনা করিতে সকলেরই অধিকার আছে; সুতরাং লেখককে অনেক সাবধান হইয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে হয়; কাজে কাজেই লেখকের জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই শিক্ষা ও অনুসন্ধানের ফল বহু আলোচনার পর গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিলে,

সে বিষয়টী লেখকের হৃদয়ে যেমন গাঁথা হইয়া থাকে, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

যে সমস্ত বিজ্ঞানাদিশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় চিন্তাশীল লেখকগণ যে ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা আলোচনা করা এবং আলোচনাদ্বারা দোষগুণ বিচার করা জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বিতীয় পথ। এই প্রণালী সাবধানে অনুসরণ করিলে প্রতিভাশালী লোক কেবল যে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে এমন নহে, গ্রন্থের ভ্রম বাহির করিয়া জগতের মহান্ উপকার সাধনে সমর্থ হয়। গ্রন্থকার জগতের বন্ধু; যে গ্রন্থের ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিতে পারে, সে গ্রন্থকর্ত্তারও পরম উপকারী।

নিরপেক্ষ সমালোচনা জ্ঞানোন্নতি-সাধনের আর একটী উপায়। সংসারে যাহা কিছু উপকারী, স্বাধীন, নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা দোষশূন্য হইলে তৎ-সমস্ত অগ্নিদগ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় ক্রমেই অধিক উজ্জ্বল হয়। পথিকের পথপার্শ্বে আলোক রাখিলে তদ্দ্বারা কেবল পথিকের উপকার হয় না, যে রাখে তাহার পথও পরিষ্কার থাকে। সমালোচকের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

লিখিবার শিক্ষা জ্ঞানোন্নতির আর একটী পথ।

সুন্দর অক্ষরে লিখিতে শিক্ষা করা একটী প্রধান গুণ। লেখা চিত্রবিদ্যা বিশেষ। অক্ষরগুলি সুন্দররূপে চিত্র করিতে পারিলে কেবল আপনার মনে সুখবোধ হয় এমন নহে; তাহাতে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রচনাপ্রণালীর সামান্য দোষগুলিও ভুলাইয়া দেয়।

গ্রন্থশিক্ষা সম্বন্ধে আরও কএকটী বিষয় লিখিবার বাকী আছে। কোন বিষয় প্রথম, কোন বিষয় শেষে শিখিতে হইবে; এবং কোন বয়সে স্মৃতিশক্তি কি পরিমাণ ধারণা করিতে সমর্থ, উপযুক্ত অভিভাবক এবং শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, তাহা ভালরূপে বিবেচনা করেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক ভাল ছাত্র গুরুর অবিবেচনার দোষে নষ্ট হইয়াছে। তাহারা বাল্যকালে যে পরিমাণ শিখিবার বিষয় মনে ধারণা করিতে সমর্থ ছিল, তাহা হইতে অনেক অধিক বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়াতে তাহারা কিছুই শিখিতে পারে নাই। স্বর্ণডিম্ব-প্রসূতি হংসীর প্রাণনাশের ন্যায় দুরাশার ফল এইরূপই ঘটে। পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত আহার করিলে যেমন তাহা জীর্ণ হয় না, কেবল পীড়া জন্মে, তেমনই পরিমাণাতিরিক্ত বিষয় আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলে, স্মৃতিশক্তির অজীর্ণ-রোগ জন্মে। উহা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া বরং ভ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

আমরা শরীর রক্ষার্থ যাহা আহার করি, তাহার

সহিত মনের পুষ্টি-সাধনোপযোগি-বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। আহার্য্য বস্তু শরীরের উপযোগী হওয়া আবশ্যক; সুপাচ্য এবং জীর্ণযোগ্য না হইলে তাহাতে শরীরের উপকার হয় না; যাহার আহার্য্য লঘুপক্ক হওয়া আবশ্যক, ঘৃতাদিদ্বারা গুরুপক্ক আহার্য্য তাহার সহ্য হয় না। ধাতু-বিশেষে গুরুপক্ক বস্তুই আবার শরীরের উপযোগী হয়; সাধারণ খাদ্যে সেরূপ লোকের অপকার জন্মে। বিজ্ঞ চিকিৎসক বা প্রতিপালক এ সকল বিষয়ে অবহিত। মনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কদর্য্য ও অশ্লীল রচনার ন্যায় কদর্য্য ও দূষিত বস্তু আর নাই; মনে তাদৃশ খাদ্য সহ্য হইবে না; তাহাতে মন পীড়িত, দুর্ব্বল, কেন্দ্রভ্রষ্ট, কুচিন্তা-জড়িত, ভ্রান্তিপূর্ণ এবং চিন্তা করিবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। আবার সাত বৎসর বয়স্ক বালকের মন কখনও সাঙ্খ্যদর্শন বা জ্যোতিষশাস্ত্র জীর্ণ করিতে সমর্থ নয়; তাহাতেও মনের অপকার ও অজীর্ণ-দোষ হইবে।

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন উভয়ই বড় কঠিন কার্য্য। প্রথম হইতে সাবধান না হইলে সমস্ত জীবন বিফল হয়। সমস্তদিন আলস্যে কাটাইয়া তণ্ডুলার্থী ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে ধান্য শুষ্ক করিতে চেষ্টা করিলে যেমন তাহার তণ্ডুলাহরণ ঘটে না, তেমনই, সময় হারাইয়া শিখিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টাও বিফল হয়। অধ্য-

য়নেও সৎসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুলোকের সামান্য আলাপ হইতে যে শিক্ষা, যে পরিমাণ ভাবসংগ্রহ হয়, অধীত বিষয় বুঝিবার জন্য যে পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না ; অসাধুসঙ্গ উন্নতির প্রতীপগামী।

ভাল ছাত্র জীবনে কিছু দূর অগ্রসর হইলে আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইতে পারে। কোন কোন ছাত্রের সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, তাহারা দশ বৎসর বয়সে নিজে শিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, যে পথ প্রকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করিয়া লইয়াছে, সুবিজ্ঞ অধ্যাপক বা অভিজ্ঞ পরিদর্শক তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

প্রিয় বালক! যদি জীবনে উন্নতি করিতে চাও, তবে জীবনের প্রথম হইতে সাবধানে অধ্যয়ন করিতে থাক। যতই অধ্যয়ন করিবে, ততই শিখিতে পারিবে। অধীত বিষয়ের যতই চিন্তা ও অনুশীলন করিবে, ততই তাহা তোমার আয়ত্ত হইবে, তুমি তাহার নূতন সৌন্দর্য্য, অভিনব মাধুর্য্য অনুভব করিবে। আপন চেষ্টায় যখন একটী সদ্ভাব বাহির হয়, নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয়, তখন মনে বিমল আনন্দ লাভ করা যায় ;—পৃথিবীর কোন আনন্দ তাহার সহিত উপমেয় নহে। মানব-

জীবনে ইহাই প্রকৃত স্বর্গসুখ। জীবনে কিছুই অসাধ্য নাই, অসম্ভব নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন, অনুসন্ধিৎসু অন্তঃকরণ জগতে চিরদিন বড় হইয়াছে, অসাধ্য সাধন করিয়াছে, এ কথাটী যেন তোমার অন্তঃকরণে নিয়ত প্রতিফলিত থাকে।

(৩)

ব্যবসায়শিক্ষা।

যে পথ জীবনের লক্ষ্য, যাহা অবলম্বন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করা ছাত্র-জীবনের আর একটী কর্ত্তব্য। কেহ রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া, কেহ বা তৎপূর্ব্বে বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায় শিক্ষা করে। শিক্ষিত লোক ব্যবসায়শিক্ষা করিলে যে অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মার্জ্জিতবুদ্ধি এবং সংযত-চিত্তবৃত্তি হইয়া যাহা কর তাহাই সুসম্পন্ন হইবে। লৌহ-ময় অস্ত্র কার্য্যসাধনপক্ষে আবশ্যক; কিন্তু তাহার মধ্যে শাণিত এবং অশাণিত অস্ত্রে যে প্রভেদ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ীর মধ্যে তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রভেদ। অশিক্ষিত ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস-দ্বারা পুরাতনপথে কথঞ্চিৎ কার্য্যসাধনে সমর্থ বটে, কিন্তু নূতন বিষয় উপস্থিত হইলে সে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। অস্মদ্দেশীয় লোক অশিক্ষিত, এবং বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় লোক শিক্ষিত ব্যবসায়ীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অনেক ব্যবসায় আছে। আমাদের দেশে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই, শিল্প শিক্ষার্থ সামান্য চেষ্টা

আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এবং বর্ত্তমান সময়ে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প শিক্ষার্থ ভাল ভাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এ দেশে কৃষির ঠিক একরূপ অবস্থা সহস্র সহস্র বৎসর চলিতেছে, বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত সাহায্যদানে হস্ত প্রসারণ করে নাই, শারীরিক পরিশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে হ্রাস করা হয় নাই। এ দেশে কৃষিকার্য্য দ্বারা কেহই বড় লোক হইতেছে না। নীল, চা, রেশম, কার্পাস প্রভৃতি লাভজনক কৃষি হয় উপেক্ষিত, না হয় বিদেশীয় লোকের হস্তগত। অন্যদেশীয় লোকে জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতীর বাঁধিয়া ফেলিতেছে, বালুকা ও প্রস্তরে যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা স্বর্ণ ফলাইতেছে, আর আমাদের দেশে শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া উর্ব্বরা ভূমি পতিত ও অকর্ম্মণ্য রহিয়াছে। অপকৃষ্ট প্রণালীর শারীরিক-পরিশ্রম-পরায়ণ কৃষক অবজ্ঞার পাত্র; তাহার স্থান নিম্নতম শ্রেণীতে; যদি কাহাকে মূর্খ ও হতভাগ্য বলিয়া গালি দিতে হয় আমরা তাহাকে 'চাষা' বলি। আমরা চাকর হওয়া সম্মানজনক মনে করি, কুক্কুরবৃত্তি-তুল্য প্রভুতোষ-দাসবৃত্তি লাভ করিতে কতই চেষ্টা করি, কিন্তু পরম পবিত্র, স্বাধীন, সম্মানজনক কৃষিব্যবসায় ঘৃণা করিয়া থাকি। সুতরাং দেশ এত দরিদ্র, এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। শিক্ষিত

লোকে এ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে দেশের উর্ব্বরা ভূমির কৃপায় এখনও স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ এবং দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারে।

বাণিজ্য মনুষ্যের সুখের একটী প্রশস্ত পথ, অথচ এদেশে বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। সামান্য রকমের নৌকায়, অতি নিম্নশ্রেণীর লোকে যৎসামান্য মূলধন লইয়া বাণিজ্য করে। ভদ্রসন্তান সে পথে চলে না। এই গৌরবান্বিত স্বাধীন ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়। তাম্রলিপ্ত, সৌরাষ্ট্র, কাঞ্চী, কলিকট্, প্রভৃতি স্থানের 'মহাজন' 'সাধু' 'সওদাগর'দিগের বিবরণ এখন পিতামহীর উপকথায় সীমাবদ্ধ। তিনি যখন, "এক যে সওদাগর" বলিয়া আরম্ভ করেন, তখন শুনিতে পাই, ধনপতি, লক্ষপতি, চান্দ, শ্রীমন্ত সওদাগর এদেশে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠীদিগের বিবরণও এখন উপন্যাস। শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করে চাকরী তাহাদের, এবং বাণিজ্য সাহেবদের জন্য।

অর্থশাস্ত্র এদেশে কেহ অধ্যয়ন করে না, সম্মিলিত মূলধনের বল কেহ বুঝিতেও পারে না। মূলধন দশ লক্ষ টাকা হইলে তাহার লাভ যদি আড়াই লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে এক হাজার টাকা মূলধন হইলেও যে আড়াই শত টাকা লাভ হইবে এই তাহাদের বিশ্বাস। মূলধন যত অল্প, ব্যয়ের ভাগ তত অধিক পড়ে, লাভ

অল্প হয়; মূলধন যত অধিক, অনুপাতমতে ব্যয় তত কম লাগে, লাভ বেশী হয়; এ কথা তাহারা ভাবিয়াও দেখে না। কেবল তাহা নহে। অল্প মূলধনে বহির্ব্বাণিজ্য চলে না; এক দেশের দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া গেলে স্থলবিশেষে দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা, কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্যে সে স্থলে টাকায় এক আনা লাভ হওয়াই কঠিন। মনে কর, তণ্ডুল আজ এখানে প্রতিমণ দুই টাকা দরে ক্রীত হইল। জাপানে তাহার মণ আট টাকা, ইংলণ্ডে বার টাকা এবং আমেরিকায় ষোল টাকা। কিন্তু এ দেশের অভ্যন্তরে ঢাকায় দুই টাকা মণ থাকিলে, কলিকাতায় দুই টাকা চারি আনা, বারাণসীতে আড়াই টাকা, বোম্বাই নগরে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন টাকা হইতে পারে। এখন ব্যয় যত অধিক হউক না কেন, একত্র যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে বহির্ব্বাণিজ্যে কত লাভ হয় একবার হিসাব করিয়া দেখ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইংরাজ বণিক্‌গণ আফ্রিকায় এবং এদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যেক বৎসরে মূলধন দ্বিগুণ করিতেন। দশলক্ষ টাকার একটী কারবারে যাহার এক হাজার টাকার অংশ, সে যদি বিশ বৎসর পর্য্যন্ত টাকা উঠাইয়া না লয়, আর সুদে মূলে এক হইয়া টাকা খাটিতে থাকে, তাহা হইলে ঈদৃশ দ্বিগুণ লাভের বাণিজ্যে বিশ বৎসরান্তে তাহার

এক সহস্র টাকায় মোট ৫২,৪২,৮৮,০০০৲ টাকা হইতে পারে। প্রতি টাকায় চারি আনা মাত্র লাভ হইলেও এই নিয়মে একহাজার টাকা বিশ বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকারও অধিক হয়। এই জন্যই ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় এত "কোম্পানি বা বণিক্ সমিতি" সুখে উন্নতি লাভ করিতেছে; এবং আমাদের দেশে রাম শ্যামকে, শ্যাম যদুকে দেউলিয়া করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে প্রতিবেশীর অধিক অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়া নিজের অল্প কিছু অনিষ্ট যদি সঙ্ঘটিত হয় তাহাও স্বীকার্য্য! আজ যৌথ কারবারের উপকারিতায় ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী। তাহার ঐশ্বর্য্য এত অধিক যে, ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়নের দর্প চূর্ণ করিতে ইংলণ্ড একাকী আট সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বসেন। অথচ তাহাতে ইংরাজ বণিক্ নিঃস্ব বা দুর্ব্বল হন নাই। এই জন্যই বলে "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস"! অতএব অর্থশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া, মিলিত মূলধন ও যৌথ বাণিজ্যের বল ও ফল বুঝিয়া, শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য যে, বাণিজ্য-ব্যবসায় শিক্ষা করে, এবং আলস্য ও কুসংস্কার দূরে রাখিয়া বহির্ব্বাণিজ্যদ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি ও আত্মোন্নতির সহিত দেশোন্নতি সাধন করে।

শিল্প, ব্যবসায়ের আর একটী প্রধান অঙ্গ। এদেশে

পূর্ব্বকালে অনেক দিন সূক্ষ্মশিল্পের সবিশেষ আদর ছিল। তদ্দ্বারা তন্তুবায় এবং কর্ম্মকার এই দুই শ্রেণীর লোক বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিত। ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের কারুকার্য্য, বারাণসীর সূক্ষ্মশিল্প, কাশ্মীরের শাল প্রভৃতি প্রাচীন মাসিডন এবং রোমরাজ্যে অত্যন্ত আদৃত ছিল। এখন হস্ত-কৌশল যন্ত্রবলের নিকট পরাস্ত, সূক্ষ্মশিল্পের অধিকাংশ এখন যন্ত্রপ্রসূত, সুতরাং বহুল এবং সুলভ। কাজেই এখন এদেশীয় শিল্পিগণ ইয়োরোপীয় বণিক্‌গণের দোকানে বেতনভোগী চাকর, না হয় ভিন্ন প্রণালীতে ভিন্ন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত। যতদিন শিক্ষিত লোক এই সমস্ত সূক্ষ্মশিল্পের কার্য্যে মনোনিবেশ না করিবে, যতদিন হস্তের কার্য্য যন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া শ্রমলাঘব সম্পাদনে সমর্থ না হইবে, এবং বুদ্ধি-কৌশলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন না করিবে, ততদিন দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না। আজ যে এদেশের সহিত তুলনা করিলে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্য পুরাণবর্ণিত সুরলোক বা গন্ধর্ব্বলোক বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ঐ সমস্ত দেশে শারীরবল উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধিবল এবং মনের বলের প্রতি অধিক নির্ভর করা হয়। তাহাদের কার্য্যবাসনা ও বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, প্রতিভা উজ্জ্বল। তাহারা যদি অনু-

করণ করিতে বসে, তবে আমাদের ন্যায় পরিচ্ছদ এবং দোষানুকরণ করে না, যেখানে যে গুণ পায় তাহা গ্রহণ এবং দোষ বর্জ্জন করে। সুতরাং তাহারা আবিষ্কার-পরায়ণ এবং উন্নতিসাধক। আজ তাহাদের দেশ যন্ত্র-ময়। আমাদের এক সহস্র লোকে যাহা করিবে, তাহা-দের একটী যন্ত্রে তদপেক্ষা ন্যূন সময়ে তদপেক্ষা অধিক সাধন করিতে সমর্থ। আমরা তাহাদের সহিত প্রতি-যোগিতায় কিরূপে কৃতকার্য্য হইব ? আজ ভারতবর্ষের যে দিকে চাও,কেবল ইংরাজ-প্রতিভার কীর্ত্তিস্তম্ভ চারি-দিকে বিরাজমান ;—ইংরাজের রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বাণিজ্যপোত, সূতার কল, জলের কল, কর্ত্তনযন্ত্র, সীবন-যন্ত্র, ঘটিকাযন্ত্র, তাপমান, বায়ুমান, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ; ইংরাজের মানমন্দির, ইংরাজের চিত্রকার্য্য, ভাস্করকার্য্য, স্থপতিকার্য্য। চারিদিক ইংরাজময়। আমাদের সম্বল অভিমান, অসার বক্তৃতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। যেমন গভীর সমুদ্রে ক্ষুদ্র তটিনীর জল মিশিয়া যায়, প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে প্রদীপের ক্ষীণজ্যোতি লীন হয়, অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে শিশুর ফুৎকারের চিহ্নও থাকে না ; তেমনই আজ ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি ইংরাজের প্রখর প্রতিভা এবং আবিষ্কারশক্তির নিকট একবারে নিষ্প্রভ, বিলীন এবং অস্তিত্ববিহীন।

বাস্তবিক বাহ্যসভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই কএকটী

বটে ঃ—শ্রমলাঘব, শ্রমবিভাগ, অর্থের প্রকৃত ব্যবহার, মূলধন একত্র করিয়া যৌথ-ব্যবসায়-পরিচালন, বিদেশীয় দ্রব্য স্বদেশে যতদূর সম্ভব অল্পমূল্যে আনয়ন এবং স্বদেশজাত দ্রব্য বিদেশে যতদূর সম্ভব অধিক মূল্যগ্রহণে প্রেরণ। ইংরাজ এই সভ্যতার মূলমন্ত্রে আজ সভ্য-জগতের দীক্ষাগুরু; ইহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়া, ইংরাজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অধ্যবসায়-স্রোতে ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন ভাসিয়া গিয়াছেন, মিরকাশেম বঙ্গের সিংহাসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়াছেন, সিরাজউদ্দৌলা সে স্রোতে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছেন! যদি অনুকরণ ভাল বাস, ইংরাজের এই গুণ একবার আপন করিয়া লও।

শ্রমলাঘবের চেষ্টায় যন্ত্রের আবিষ্কার; শ্রম-বিভাগও মানবের উন্নতির সামান্য সহায় নহে। সামান্য দেশলাই প্রস্তুত করিতে কত শত লোক খাটিতেছে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কতকগুলি লোক অতি পাতলা করিয়া বাক্স প্রস্তুত করিবার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে; কেহ করাত লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাগজে বর্ণ ফলায়, কেহ অক্ষর ও ট্রেড্‌মার্ক মুদ্রিত করে, কেহ বাক্স গঠন করে, কেহ শলাকা প্রস্তুত করে, কেহ তাহা খণ্ড খণ্ড করে, কেহ দীপক প্রস্তুত করিতে নিবিষ্ট, কেহ শলাকার মুখে তাহা সংযুক্ত করিতে

অবহিত, কেহ আবার তাহা শুষ্ক করে, কেহ বাক্স মধ্যে পূর্ণ করে। ইহার অনেক কার্য্য কলেও সম্পাদিত হয়। এত লোক খাটে, অথচ এতদূরে আনিয়াও ইংরাজবণিক পয়সায় তাহার তিনটী বাক্স বিক্রয় করিতে সমর্থ। তাহাতে লাভও যথেষ্ট হয়। আজ সেই দেশলাই প্রস্তুতকারী ব্রায়ান্ট এবং মে পৃথিবীর মধ্যে বিলক্ষণ ধনী বলিয়া গণ্য। কৌশলপূর্ব্বক শ্রমবিভাগ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

আমাদের দেশেও অনেক ধনী লোক আছেন। তাঁহারা চিরকাল অর্থ সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া রাখেন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইতেছে। কেহ বা প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা পুকুর প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহা সঞ্চিত অর্থে পূর্ণ করিতেছেন। চোর, ডাকাইত, অগ্নি বা ধূর্ত্তলোক কর্ত্তৃক কখনও কিছু কিছু হ্রাস হয় এই মাত্র। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল সঞ্চয়ী লোক কেবল আপনার নহে, দেশের শত্রু। মূলধন সিন্দুকে বদ্ধ রাখা এবং ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হইবে তাহা বস্ত্রে বান্ধিয়া গৃহে রাখিয়া দেওয়া, একই রূপ। কেহই বৃদ্ধি পায় না, আপনার উপকার সাধন করে না; অন্যেরও হিত করিতে পারে না। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে পড়িলে

তাহা যেমন বৃদ্ধি পাইয়া স্বামীর উপকার করিত, তেমনই তাহা শত শত লোকের প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিত। আমরা অর্থের প্রকৃত ব্যবহার জানি না বলিয়াই এ অবনতি। ইংরাজ একটী দিনও টাকার বোঝা বয় না। তাহার যে এত অর্থ তাহার সহিত কেবল কাগজে সম্বন্ধ। অর্থ আছে, ব্যাঙ্কে আমানত রহিয়াছে। আমাদের যেমন মুদীদোকানে চিঠি যায়, তাহাদের তেমনি দৈনিক প্রয়োজন অনুসারে ব্যাঙ্কে চিঠি যায়। ব্যাঙ্কে আমানতি অথবা কারবারে ব্যবহৃত অর্থ প্রতিদিন অর্থ প্রসব করিতেছে, একদিনও নিরর্থক বসিয়া থাকে না। এ নীতিও ইংরাজের শিষ্যানুশিষ্য হইয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শিল্পজাত দ্রব্য সকল দেশেই প্রস্তুত হয়। যাহারা অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত, তাহারা আমদানি রপ্তানির মূল তত্ত্ব জানে। সুলভ মূল্যে ক্রয় এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় ব্যবসায়ের প্রাণ। ব্যবসায়ের এই অংশ শিক্ষা বড়ই কঠিন। অশিক্ষিত লোকে তাহা পারিবে না, কারণ অর্থনীতি বড় কঠিন শাস্ত্র। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এ বিষয়ে জগতের শিক্ষাগুরু। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের এবং চীন ও জাপানের লোকে এখন অনেক পরিমাণে এ তথ্য অবগত হইয়াছে।

এক শিল্প সংজ্ঞায় অনেক বুঝায়। সর্ব্বপ্রকার

কারুকার্য্য, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতির কার্য্য প্রভৃতি সমস্তই শিল্পের অন্তর্ভূত। ইংরাজী ভাষায় শিল্পের যে প্রতি-শব্দ আছে তাহাতে সঙ্গীত বিদ্যা, কবির কবিত্ব প্রভৃতিও আকর্ষণ করে। ইহার প্রত্যেকটী এক এক স্বতন্ত্র ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা করিলে অনেক উন্নতি সাধন করা যায়। এদেশে স্বর্ণকারগণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইয়োরোপীয় শিল্পি-গণ স্বর্ণাদি-ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য যেরূপ মসৃণ করিতে সমর্থ, শিক্ষার সাহায্যে তাহার পরিমাণ ও পরিমাপের সমতা রক্ষায় যেরূপ পারদর্শী, এদেশীয়গণ সেরূপ নহে। সংযোগ-স্থানের মিলন, তাপের পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি শিক্ষিতের কার্য্যে এদেশের স্বর্ণকারেরা অপটু। বস্ত্র বয়ন করিতে এদেশের তন্তুবায়গণ পূর্ব্বে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইত। এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহাদের কারুকার্য্য ন্যূন নহে। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মবস্ত্র এখনও প্রশংসনীয়। বারাণসীর ফুলের কাজ, কাশ্মীরের শাল এখনও অদ্বিতীয় কিন্তু তাহা বহুমূল্য। এক একটী বস্তু সমাপন করিতে বিস্তর সময় লাগে। অধুনা ইয়োরোপে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমলাঘব হয়, তথাকার শিল্পীরা ঐ সকল বস্তুর এরূপ আশ্চর্য্য অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং উহা এত

অল্প মূল্যে এদেশের বাজারে বিক্রয় করিতেছেন যে, আমাদের দেশের এ প্রাধান্যটুকুও আর অধিকদিন চলিবে এরূপ আশা করা যায় না।

যেমন কেবল সাধারণ সূত্র অভ্যস্ত হইলেই ক্ষেত্র-তত্ত্বের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না, তেমন কেবল পুস্তক মুখস্থ করিলেই ছাত্র-জীবনের কার্য্য শেষ হয় না। যে উত্তরকালে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবে তাহাকে প্রথম হইতেই সেই গন্তব্য পথে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন একবার বিশ্ববিদ্যালয় স্পর্শ করিলেই হয় চাকরী, নয় ওকালতী, নয় মোক্তারী করিবার সঙ্কল্প হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এ কথা কাহাকেও শিক্ষা দেয় না। চাকরী করিতে সকলে লোলুপ। অধঃপাতের স্পষ্টতর লক্ষণ আর কি আছে? শিক্ষিত লোকে যে কোন একটী ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আত্মোন্নতি-সাধন করিতে পারে। বৈষয়িক উন্নতি কেবল মস্তিষ্ক-বিলোড়নের ফল মাত্র। লেখাপড়া শিক্ষা করিলে যে চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্য হয় এ কথা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং সাধারণশিক্ষা সমাপন করিয়া ব্যবসায়শিক্ষা আরম্ভ করা বিহিত।

আজ তন্তুবায় যে প্রণালীতে সূত্র মসৃণ করে, তাহাতে বিস্তর সময় লাগে। শিক্ষিত লোক তৎসম্বন্ধে অতি সহজপথ উদ্ভাবন করিয়া শ্রমলাঘব করিতে পারে।

শ্রমলাঘবের সহিত মূল্য অল্প হয় এবং ব্যবসায়জাত বস্তু অধিক বিক্রীত হইতে পারে। বয়নাদি কার্য্যে কত অল্প সময়ে কত অগ্রসর হওয়া যায় তাহা ইয়োরোপীয় বয়নযন্ত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য।

স্বর্ণকারের কার্য্যেও উন্নতি করিবার অনেক আছে, চিন্তাশীল শিক্ষিত যুবক তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহার গঠনে নূতনত্ব দেখাইতে পারেন। এক্ষণে স্বর্ণকারগণ পাইন দ্বারা সংযোগ করিয়া মূল্যবান্ ধাতু নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা তাপের নিয়ম জানে না; পাকা রং করিতে সমর্থ নহে; অনেকরূপ গিল্ট করা তাহাদের অজ্ঞাত। অতি সামান্য চেষ্টায় এ সমস্ত দোষ সংশোধিত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

দেশীয় কুম্ভকারগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শতবৎসর পূর্ব্বে তাহারা যাহা ছিল, আজও তাহাই আছে। তাহাদের প্রস্তুত দেবমূর্ত্তিগুলি সুন্দর নহে। সেই অপকৃষ্ট প্রণালীর মাটির বাসন আজও দেশব্যাপি—উন্নতি নাই। কুলাল দণ্ড ও চক্র যাহা ছিল, ঠিক সেইরূপই আছে। আজ যদি কোন প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবক কুম্ভকারের বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে শ্রমলাঘব সম্পাদন করিয়া এ বিভাগে যে কত উন্নতি করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা

করা সুকঠিন। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃণ্ময় পদা-র্থের ভঙ্গপ্রবণতা হ্রাস করা যায়, মৃত্তিকার স্বাভাবিক রং দূর করিয়া বর্ণান্তর ঘটান যায়। গঠনের সৌষ্ঠব, নূতন নূতন বর্ণে রঞ্জন, দগ্ধ করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা বর্ণের বৈচিত্র্য সম্পাদন প্রভৃতি এ বিভাগে যে কত উন্নতি সাধন করা যায়, তাহার নির্ণয় নাই। মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর বা স্ফটিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। দরিদ্র দেশে সুন্দর সুন্দর সুলভ মূল্যের মৃণ্ময় বস্তু প্রস্তুত হইলে প্রকৃত উপকার হয়।

এদেশে চর্ম্মকারগণের ব্যবসায় নিতান্ত অনুন্নত। এদেশীয় পশুচর্ম্ম বিদেশে পরিষ্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করা হয়, এদেশীয় চর্ম্মকার তাহা জানে না। শত বৎ-সর পূর্ব্বে তাহার যে দুরবস্থা ছিল, আজও তাহাই আছে। ইয়োরোপীয় বা চীনদেশীয় কারিকরের হাতের জুতা আজও পূর্ব্ববৎ আদৃত। এদেশীয় চর্ম্ম-কার যদি জুতা প্রস্তুত করে, তাহা বিশ্রী, দুর্গন্ধ, এবং এবং ব্যবহারের অযোগ্য। যদি শিক্ষিত চর্ম্মকার এ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করে, কৃতবিদ্য যুবক এ বিভাগে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইয়োরোপীয় এবং চীনদেশীয় পাদুকা ক্রয় বন্ধ করিতে এবং দেশের ধন-বৃদ্ধি করিতে তাহাদের বড় কষ্ট হয় না।

সূত্রধরের কার্য্যও নিতান্ত অনুন্নত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চীন, জাপান প্রভৃতি রাজ্য আজও সে বিষয়ে অতুল্য। তথাকার কাষ্ঠনির্ম্মিত জিনিস ও বার্ণিস্ আজও সর্ব্বত্র আদৃত। ব্যবসায়-শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত অল্প। দেশীয় লোকে এ কার্য্য সম্মানজনক বা লাভজনক মনে করে না, অথচ সামান্য গৃহস্থও সূত্রধরের সাহায্য না লইয়া পারে না। এদেশীয় সূত্রধরের যন্ত্রগুলি দেখিলেও দুঃখ হয়। আজ যদি শিক্ষিত যুবক চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে না ফিরিয়া এই পবিত্র এবং পরিষ্কার ব্যবসায়ে মনোযোগ দেয়, তাহা হইলে অনায়াসে দেশের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

বর্ণবিদ্যা আমাদের দেশে একবারে নাই। কোন একটী শিক্ষিত যুবক আমেরিকা হইতে এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিলেন। তাঁহার মূলধনের অভাব; সুতরাং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। কিরূপে রং প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা কিরূপে পাকা ও স্থায়ী হইতে পারে, কোন রং অন্য কোন রংএর সহিত কি উদ্দেশ্যে মিশাইতে হইবে, দৃষ্টিশক্তির সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এসকল বিষয় এদেশীয় লোকে জানে না। এ যে একটি শিক্ষার বিষয় তাহাও অনেকের ধারণা নাই। শিক্ষিত যুবকের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা অতীব কর্ত্তব্য।

চিত্রবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যা ; অথচ তাহা একটী অর্থ ও সম্মানের বিদ্যা বলিয়া কয়জন লোকে জানে? সহস্র সহস্র বৎসর তাহা এদেশে অনাদৃত, অথচ সেই কাল ব্যাপিয়া অন্য দেশে তাহার আদর। সুতরাং অন্য দেশের সহিত এদেশের এ বিষয়ে অত্যন্ত অধিক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। একটি চিত্রের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা ; একজন চিত্রকর তাদৃশ একটী চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন এবং একজন মহাকবির ন্যায় সম্মানিত হন, একথা এদেশের কে বিশ্বাস করিবে? যদি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত মহোদয়গণ বিলাতের অনেক বড়লোকের গৃহে, রাজকীয় যাদুঘরে, এবং অন্যান্য স্থানে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বিশ্বাসই করিতাম না। শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য যে এই যশোদায়িনী, অর্থকরী এবং অমরত্ববিধায়িনী বিদ্যার উন্নতি-সাধনে প্রাণপণে যত্ন করে।

বাস্তবিক, বর্ণে চিত্রিতই হউক, কাষ্ঠে নির্ম্মিতই হউক, আর প্রস্তরে ক্ষোদিতই হউক, প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি দৃশ্যকাব্যে পরিণত হইলে, তাহা কালিদাস বা সেক্সপিয়ারের দৃশ্যকাব্য হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ফিডিয়াস, রাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি অমর শিল্পিগণের হস্তের কোন একটী ছবির দিকে যতই নিরীক্ষণ কর, ততই তাহা সজীব বলিয়া ভ্রম হয়,

তাহার প্রতি অণুতে মহাকাব্যের মাধুর্য্য প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঐ সমস্ত জীবিত এবং মূর্ত্তিমান্ কাব্য ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব সুখের লহরী খেলিতে থাকে তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ইলোরা ও এলিফাণ্টায় যে অসামান্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের চিহ্ন দেদীপ্যমান, যদি ঐ সকল মূর্ত্তি ফিডিয়াসের ন্যায় ভাবুক কর্ত্তৃক ক্ষোদিত হইত, তাহা হইলে আজ তাহাদিগকে সমস্ত সভ্য পৃথিবীর আদরের বস্তু বলিয়া গণনা করা যাইত সন্দেহ নাই। সাধারণ শিক্ষার পর স্ব স্ব রুচি অনুসারে এ বিভাগে উন্নতি সাধন করাও একটী পবিত্র ও প্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে শত শত অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেটী সুন্দর, প্রায় সেইটীই ইয়োরোপীয় স্থপতিবিদ্যানুসারে গঠিত। আমাদের দেশে অট্টালিকার দৃঢ়তা সম্পাদনের অনেক উপায় জানা ছিল। কিন্তু যাহাতে কক্ষগুলি সুবিস্তার ও দৃষ্টিশোভন হয়, বিশুদ্ধ বায়ু তাহাতে সর্ব্বদা সঞ্চারিত থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল না। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সে দৃঢ়ীকরণোপায় ভুলিয়াছি, অথচ তৎপরিবর্ত্তে সৌষ্ঠব সম্পাদনাদিও শিক্ষা করি নাই। এ বিভাগের উন্নতি-সাধনেও ছাত্র-জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত।

যেমন একদিকে যশোমন্দিরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কাব্যাদি একটী তোরণ, তেমনই সঙ্গীতশাস্ত্র আর এক দ্বার। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের আজ এমনই অবস্থা যে, কেহই আত্মীয়স্বজনকে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসাহ প্রদান করিতে সাহসী হয় না। অধিকাংশ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী লোক নিতান্ত কলুষিত-চরিত্র। বিশুদ্ধ গান সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীতে মন যেমন আর্দ্র ও তদ্‌গত করে, তেমন আর কিছুতেই করে না। কিন্তু সে ভাব গায়কগণমধ্যে কয়জনে বর্ত্তমান? বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইলে অধিকাংশ লোক বিলাসভাবোদ্দীপক তরল তাল অভ্যাস করে, গান করিতে যাহা সহজ, যাহাতে ক্ষণিক আমোদ, তাহারই আদর করিতে থাকে। সুতরাং সঙ্গীতশাস্ত্র দিন দিন অধোগমন করিতেছে। যাহারা অলস, অকর্ম্মণ্য, আজ ঘটনাবশতঃ কেবল তাহারাই সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করে। যে সময় বড় দীর্ঘ ও ভারী বোধ হয়, তাহা আপনার জীবন হইতে শীঘ্র সরাইয়া রাখিবার নিমিত্ত লোকে সঙ্গীতের আশ্রয় লয়। যেমন কোন পুস্তকালয়ে শত শত ভাল গ্রন্থ থাকিতেও আজ কাল উপন্যাসের আলমারি অধিক খোলা হয়, তেমনই সঙ্গীতের উত্তম অঙ্গ অনেক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল তরলতালযুক্ত অশ্লীল সঙ্গীত অধিকাংশের মন আকর্ষণ করে। এইরূপে সুখকর, সাধনার সাধন সঙ্গীত-

শাস্ত্র আজ জঘন্যরুচি, জঘন্যচরিত্র যাত্রা বা কবিওয়ালার একচেটিয়া সম্পত্তি! আর যদি কোনও ভদ্রসন্তান সঙ্গীতে অধিক আসক্তি দেখান, আমরা তাঁহার নাম অন্ততঃ মনে মনে ভদ্র-তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেই! সমাজের এমনই দুরবস্থা!

যদি সাধুসঙ্গে ও সৎপথে থাকিয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা করা যায়, গীতবাদ্যে রুচি ও অধিকার জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কেবল মনের একটী বিশুদ্ধ আমোদ জন্মে তাহা নহে, ভক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি মনোবৃত্তির উৎকর্ষও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার জন্য দুইটী দ্বার আছে, একটী প্রশস্ত ও আশু সুন্দর, একটী সঙ্কীর্ণ ও আশু কষ্টপ্রদ। অগ্রসর হইবার কালে উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের অভাবে তরুণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত ও সুগমপথে যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। এ বিভাগে সদুপদেশকের সংখ্যা অতি বিরল; সুতরাং সঙ্গীতশাস্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে না পার, ক্ষতি নাই, অসাধু সঙ্গে কেহ অগ্রসর হইও না। কেবল এই জন্যই সতর্ক অভিভাবক আপনার অধীন বালকগণকে এখনকার প্রচলিত নাটক অভিনয় দেখিতে এবং যাত্রা গান শুনিতে সতত যাইতে দেন না; সাধ্যমত দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন।

ব্যবসায়ের অন্ত নাই; প্রধান রাজমন্ত্রীর মস্তিষ্ক

বিলোড়ন, অথবা বৃক্ষতলবাসী দরিদ্রের মৃত্তিকা খনন; ব্যবহারাজীবদিগের ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম বিচার, কিম্বা ইন্ধন-সংগ্রহকারীর কঠিন শারীরিক পরিশ্রম; প্রধানতম সেনাপতির সংগ্রাম-কৌশল, অথবা অসভ্য পার্ব্বতীয় ব্যক্তির পশুশিকার, এ সমস্তই ব্যবসায়। সাধারণ লোকের মধ্যে যে কত প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত আছে তাহার অন্ত নাই। অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ কষ্টকর। যেখানে মানসিক পরিশ্রম সেখানে সম্মান, যেখানে কেবল শারীরিক পরিশ্রম সেখানে তাহার অভাব। কিন্তু কি ছোট, কি বড়, কোন ব্যবসায়ই যেন বিকাশ পাইতেছে না, এদেশে সকলই যেন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ! যেমন অন্ধকারময় গৃহে বহুমূল্য হীরকও প্রভাশূন্য, তেমনই অজ্ঞানান্ধকারে এদেশে মানসিক ক্ষমতাশালী লোকও নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। আবার সাধারণ লোকের মধ্যে কোথা হইতে একরূপ অভিমান আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে যে বঙ্গদেশ রসাতলে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। আজ যদি পশ্চিম হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক বঙ্গদেশে না আসিত, তাহা হইলে বাঙ্গালী বড় লোকের এবং ভদ্রলোকের আর উপায় থাকিত না। একদিকে বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের হাহাকার, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিমের লোক বঙ্গে অর্থোপার্জ্জননিরত।

সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিম্নশ্রেণীর সমস্ত লোক এক্ষণে ভদ্রলোকের ন্যায় চাকরী করিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ পৈত্রিক ব্যবসায়ে যাহার মাসিক দশ টাকা আয় হইত, এখন সে পাঁচ টাকা বেতনও পায় না। কিন্তু পূর্ব্বে তাহার পরিচ্ছদ মাসিক চারি আনায় চলিত, এখন তাহার জুতা ও কাপড়ে মাসিক দুই টাকা লাগে।

আজ যদি লোকে স্ব স্ব পৈত্রিক ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনে যত্ন করিত, তাহা হইলে দেশের এ দুরবস্থা ঘটিত না। পৈত্রিক ব্যবসায় যাহাই হউক না কেন, কিছুতেই অবজ্ঞার বিষয় নহে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে উচ্চতম স্থান লাভ করাই ব্যবসায়ের এবং উন্নতির জীবন। সামান্য মুদীও তাহার শ্রেণীতে উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। যাহার কথা ও কার্য্যে বৈষম্য নাই; যাহার মনে ধর্ম্মজ্ঞান আছে; যে মিতব্যয়ী এবং সাধুচরিত্র; সে স্থিরসঙ্কল্পের সহিত আপন ব্যবসায়ে উন্নততম-স্থান লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। উন্নতির মূলমন্ত্র অধ্যবসায়। প্রিয় ছাত্র! যদি অধ্য-বসায়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, সকল অন্তরায় দূর হইবে, অতি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাহাতেই যশোলাভ করিতে এবং লোকের স্মরণীয়

হইতে পারিবে। ঐ যে তোমার হস্তস্থিত ছুরিকায় রজার্স নামটী ক্ষোদিত রহিয়াছে; ঐ সামান্য লৌহ-কর্ম্মকার যে যশোলাভ করিয়াছে, কয়জন অধ্যাপক তাহা প্রাপ্ত হন? অধ্যাপকের সম্মানের ব্যবসায়ও সম্মান প্রদান করিবে না, চর্ম্মকারের ঘৃণিত ব্যবসায়ও অসম্মানের কারণ নহে। স্বাধীন চিন্তা, অভিনব পথের উদ্ভাবন এবং উচ্চ আসন লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা, ইহাই সুশিক্ষার ফল। যদি শিক্ষায় এ সমস্ত সুফল প্রসব না করিল, মরুভূমিতে বারিবিন্দুর ন্যায় জ্ঞান-বারি শুকাইয়া গেল, তবে এমন শিক্ষালাভ অপেক্ষা অশিক্ষিত থাকাও ভাল।

(৪)

সামাজিক শিক্ষা।

মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না। তাহার আসঙ্গ-লিপ্সা অতি বলবতী। তাহার একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সাধ্যও নাই। তাহার সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ; তাহার ভক্তি ভালবাসা, ভয় বিস্ময়, এ সমস্তের অংশ লইতে, একের মানসিক চিন্তার স্রোতে অন্যের মানসিক চিন্তার স্রোত মিশাইতে, সঙ্গীর প্রয়োজন। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সহকারীর আবশ্যক।

একাকী মানব নিতান্ত নিরাশ্রয়। সহায়বিহীন মানব ইতর প্রাণী অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট। একটী গোবৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সে জন্ম হইতেই স্বাধীন; অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিতেছে, দৌড়াইতেছে, দুধ খাইতেছে। আপনা হইতেই সুকোমল শষ্পাগ্র ভক্ষণ করিতে অভ্যাস করিতেছে, আপনা হইতেই জলপান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। তাহাকে কেহ ক্রোড়ে লয় না, যত্ন করে না, উঠিতে, বসিতে, খাইতে, হাঁটিতে শিখায় না, খাদ্য ও অখাদ্য বাছিয়া দেয় না। ঝড় বৃষ্টি হইলে গোবৎসকে কে পলাইতে বলিয়া দেয়? এ অবস্থায় একটী মানবশিশু কদাচ বাঁচিত না, কদাচ বড় হইত না।

মনুষ্যের প্রয়োজন অনেক। সংসারে যত ব্যবসায় দেখিতেছি সমস্তই মনুষ্যের জন্য। মনুষ্য একাকী থাকিলে সকলের ব্যবসায় তাহার একাকী পরিচালন করিতে হইত। তাহাকে কৃষক, রজক, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, মালাকার, তন্তুবায় হইতে হইত। তাহার কাষ্ঠসংগ্রহ, নৌকাগঠন, মৃত্তিকাখনন, গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন করিতে হইত। লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাকে লৌহকার হইতে হইত; আবার সূত্রধর হইয়া লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে হইত। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, এ সমস্ত কার্য্য কোন ব্যক্তি একাকী সম্পাদন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে?

কেবল তাহাই নহে। এ ত কেবল বাহিরের আয়োজন; মনের জন্যও অনেক করিতে হয়। চিন্তা-শক্তির পরিচালন, মনোবৃত্তিগুলির গঠন ও চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার প্রয়োজন আছে। মানসিক গুণ-নিচয়ের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি নির্জ্জনে থাকিলে হইতে পারে না। সিংহব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে মনুষ্য একাকী কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করিবে? শরীর ক্ষুদ্র; বলও সামান্য। গৃহনির্ম্মাণ বা অট্টালিকানির্ম্মাণ একের কার্য্য নহে। যখন বৃহদাকার মদমত্ত হস্তী, গণ্ডার, উন্মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র আসিয়া আক্রমণ করিবে, তখন সে কোথায়

আশ্রয় লইবে, কেই বা তাহাকে রক্ষা করিবে? যখন রোগ-যন্ত্রণায় শরীর ছটফট করিবে, তখন কে তাহার নিকটে বসিয়া হস্তাবর্ত্তন করিবে, মনে সাহস ও উৎসাহ ঢালিয়া দিবে? কেই বা ঔষধ-প্রয়োগ-দ্বারা যন্ত্রণা-নিবারণ করিবে? মনুষ্য মনুষ্য ব্যতীত থাকিতে পারে না। সে যত কেন বুদ্ধিমান্, বলবান্ হউক একাকী মানব নিতান্ত নিরাশ্রয় এবং তৃণ হইতেও দুর্ব্বল। তাহাকে দলবদ্ধ পিপীলিকা বা মক্ষিকা দেখিয়াও ভীত হইতে হইবে, এবং আপনার পদশব্দেও চমকিতে হইবে।

সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যের সহায়, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট। সে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে চেষ্টা করিতে গিয়া প্রতিনিয়ত অন্যের পরিচর্য্যা করিতেছে, আপনার স্বার্থানুসরণে নিরত থাকিয়া পরোপকার সাধন করিতেছে। সে আত্মোন্নতির জন্য আবিষ্কার করে, জগৎ তাহাতে উপকৃত হয়। ধীবর মৎস্য ধরিতেছে, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবে। তোমার মৎস্যের প্রয়োজন; ধীবর তোমার জন্য মৎস্য ধরিয়া দিল। ধীবরের অর্থের প্রয়োজন, তুমি তাহার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিলে। সে মৎস্য দিয়া তোমার উপকার করিল, তুমি মুদ্রা দ্বারা তাহার উপকার করিলে। এইরূপ যেদিকে দৃষ্টি-

পাত কর, সংসারে মানবগণমধ্যে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, শ্রমবিনিময়, চাকরীবিনিময়, ব্যবসায়বিনিময়। অথচ, এটী যে কি বিষয়, কেহ তাহা বুঝে না, ভাবিয়াও দেখে না। কৃষক কার্পাস জন্মাইল; তন্তুবায় তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া দিল, সীবনকার তাহা সেলাই করিল, তুমি পরিধান করিলে। এখন দেখ, তোমরা চারিজনই পরস্পর পরস্পরের চাকর, কেহই স্বাধীন নও। অথচ, যে মানব এবম্প্রকারে চর্ম্মকার, ক্ষৌরকার প্রভৃতির চাকর, তাহারও এমনই অভিমান যে, সে স্বাধীনতার আলাপ করিয়া অবসর পায় না, ব্যবসায়-বিশেষ নিকৃষ্ট বলিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেও বিরত নহে।

এইরূপে, নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়া মনুষ্য পরস্পরের সহায় ও অবলম্বনস্বরূপ, সুতরাং সমাজবদ্ধ। একটী কৌশলনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় সমাজের কার্য্য বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্য-বুদ্ধিতে এপর্য্যন্ত যত প্রকার শাস্তির আবিষ্কার হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। কিন্তু সংসারে একাকী মানবের অবস্থা তদপেক্ষাও অধিক শোচনীয় হইত। দয়াবান্ পরমেশ্বর মনুষ্যকে তাদৃশ কষ্ট দেন নাই। কোটি কোটি মানবে ধরাধাম পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে যে যে পথ সহজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, সে সেই পথে মানবসমষ্টির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে

ব্যবসায়ের সৃষ্টি ; স্থলবিশেষে ব্যবসায় পুরুষানুক্রমিক হইল, সমাজ সংগঠিত হইয়া গেল। ঊর্ণনাভ যেমন চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া তাহার অধীশ্বর-স্বরূপ মধ্যস্থলে বিরাজমান, চতুর্দ্দিকে গমনাগমনে সমর্থ, অথচ আপনার জালে আপনি বদ্ধ ; মনুষ্যও তেমনই সমাজ-জাল বিস্তার করিয়া মধ্যস্থলে সমাসীন ; সর্ব্বত্র গমনাগমনে সমর্থ, অথচ আপনার জালে আপনি বদ্ধ।

সমাজ গঠিত হইল সত্য, কিন্তু তাহা রক্ষা করা সামান্য কথা নহে। সমাজস্থ থাকিতে হইলে মনুষ্যের অনেকগুলি গুণের আবশ্যক ত্যাগ-স্বীকার, সত্য-পরয়ণতা, বিশ্বাস, স্নেহমমতা, ভক্তিকৃতজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারবুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি না থাকিলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। ইহার কোন গুণের অভাব আমরা যাহাতে লক্ষ্য করি,তাহাকে অসামাজিক বলিয়া থাকি। কোন জাতিতে বা স্থানে ইহার একটী গুণ না থাকিলে তাহার অস্তিত্ব কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না।

যদি তুমি স্বার্থপর হও, কেবল আপনার সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত থাক, আর সংসারের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না রাখ, তাহা হইলে সমাজ তোমাকে চাহিবে না। পাদপের উপরে উপপাদপ বসিয়া যেমন তাহার রস-শোষণ করিতে থাকে, এবং মূল পাদপকে নীরস করিয়া মারিয়া ফেলে ও পরিশেষে আপনিও মরে ;

তেমনই, ঈদৃশ অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তি দ্বারা সমাজ বিনষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে তাহার নিজেরও পতন হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থই ঘৃণিত; যাহার অভিজ্ঞতা নাই, মনের দৃষ্টিশক্তি দূর-প্রসারিত নহে, কেবল অকিঞ্চিৎকর স্বার্থে সীমাবদ্ধ, তাহার চরিত্রই নিন্দনীয়। প্রিয় বালক! তুমি যদি আপনার জীবনে বল চাও, তাহা হইলে সমাজের জীবনে বল সঞ্চার কর, ঐ মহাবৃক্ষের ক্ষুদ্র একটী পত্র বলিয়া আপনাকে দেখিতে শিক্ষা কর, যাহাতে ঐ মহাবৃক্ষে রস-সঞ্চয় হয় তাহাতে অবহিতচিত্ত হও, কারণ সেই রস, সেই বল, তোমার জীবন। তাহার অভাবে তুমি শুষ্ক, ধূলিধূসরিত, বাত্যাবিতাড়িত। যে ব্যক্তি জানে যে সে কিছুই নহে, তাহার সমাজ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সে সমাজস্থ প্রত্যেকের চাকর, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; এই পার্থিব জীবন, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মলবাহী দেহদ্বারা এখানে যে কোন কার্য্য করিতেছে তাহা নিজের জন্য নহে; কার্য্যানুষ্ঠান তাহার, ফলভোগ অন্যের, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সাধু, প্রকৃত সামাজিক। সমাজে প্রাধান্য লাভ করিবার মূলমন্ত্র এই। যদি বড় হইতে চাও, ছোট হইতে অভ্যাস কর, কারণ ছোটই বড়র জনক। সুশীল, বিনয়ী এবং ধার্ম্মিক হও, ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের অনুরোধে ভস্মীভূত কর। যদি তুমি সমাজের

জন্য ত্যাগ-স্বীকার কর, সমাজও তোমার জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিবে ; কারণ সমাজ দর্পণস্বরূপ, যেমন চিত্র দেখাও, তেমনই দেখিতে পাইবে। যেমন কোন তুলা-যন্ত্রের একদিকে গুরুভার, অন্যদিকে লঘুভার চাপাইয়া দিলে লঘু বস্তু ঊর্দ্ধদিকে উঠে ও গুরুবস্তু নীচে পড়িয়া যায় ; তেমনই তুমি যদি তোমার আপনার অভিমান, গুরুত্বজ্ঞান, সমাজের নিকট ত্যাগ কর, সমাজ সকলের গুরুত্ব লইয়া নীচে পড়িয়া থাকিবে, তুমি ঊর্দ্ধে উঠিবে। এইরূপে ফলভারে নত বৃক্ষের ন্যায়, গুণভারে নত ব্যক্তি যদি আপনার ভার আপনি না বুঝিতে পারে এবং সমস্ত গুণফল সমাজের হিতার্থ সমাজের দ্বারে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সে অনায়াসে সমাজের সকলের নিকট উন্নতমস্তক হইয়া থাকিতে পারে।

বিনয় এবং ত্যাগস্বীকার সামাজিকতা-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। সত্যপরায়ণতা এবং বিশ্বাস দ্বিতীয় অধ্যায়। তোমায় সত্যবাদী হইতে হইবে এবং অন্যকে বিশ্বাস করিতে হইবে।. তুমি সত্যবাদী হইলে লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিবে। বিশ্বাসে বিশ্বাস উৎপাদন করে ; তোমার সাধু ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অধিকাংশ প্রতিবেশীই তোমার নিকট বিশ্বাসী থাকিবে। যদি কেহ অন্যথাচরণ করে,সে অসুবিধা ভোগ করিবে; কারণ সে তোমাকে একবার মাত্র ঠকাইবে,কিন্তু দশবার সে নিজে

ঠকিবে। সত্য কথা ও সত্য ব্যবহারের ন্যায় সুবিধাজনক বিনিময় সামগ্রী আর নাই। তুমি এক ব্যক্তির নিকট একবার ঠকিয়াছ, আর তাহাকে একটী পয়সার জন্যও বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাহারই অসুবিধা হইল। সত্যে হৃদয় প্রফুল্ল ও অকপট করে, পাপ-প্রলোভন হইতে বিরত রাখে। সুতরাং সমাজবন্ধনে সত্য অতি প্রয়োজনীয়। যে জাতিতে বা যে সমাজে সত্যে অধিক অনুরাগ, সে জাতির, সে সমাজের ভিত্তি অতি দৃঢ়।

ভক্তি ভালবাসা, স্নেহ মমতা সমাজ-বন্ধনের আর একটী উপাদান। একের হৃদয় অন্যের দিকে আকৃষ্ট না হইলে, পরকে আপন করিবার চেষ্টা না থাকিলে, সমাজ তিষ্টিতে পারে না। মমতা অর্থ আপন করা, আপনা হইতে অভেদ দেখা। এক আত্মা সর্ব্বঘটে বিরাজমান, রাম শ্যাম আমি একই পদার্থ, কোন প্রভেদ নাই ; এইরূপ জ্ঞান, এই সমাজব্যাপিনী সহানু-ভূতিই মমতা। সমাজের সকলকে যদি আমি ভাল বাসিতে জানি, আমা হইতে অভেদ মনে করি, তবে কাহার বিরুদ্ধে হিংসা দ্বেষ হইবে? কাহার সহিত কলহ হইবে? কে কাহাকে তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করিবে? পরিবার মধ্যে জনক জননী, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলের প্রতি যেরূপ ভক্তি ভালবাসা, স্নেহ মমতা আছে, যদি সমাজস্থ সক-

লের প্রতি সেইরূপ থাকে তবে সংসার কি সুখের স্থান হয়! বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমাজ একটী বৃহৎ পরিবার। তাহাতে গুরু শিষ্য, বালক বৃদ্ধ, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি সকলই আছে। সঙ্কীর্ণহৃদয় মানব তাহা দেখিতে পায় না। সে যে উদারতা লইয়া সংসারে আসিয়াছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার পক্ষে আজ সংসার হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সমাজ-পরিচালনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা অত্যাবশ্যক। লব্ধ উপকার স্বীকার না করিলে পুনরায় উপকার করিতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সমাজস্থ থাকিয়া প্রতিদিন, প্রতিমূহুর্ত্তে কত উপকার লাভ করিতেছি; যে, যে কার্য্য করিতেছে, তদ্দ্বারাই আমরা উপকৃত হইতেছি, অথচ আমরা এত অহঙ্কারী যে, সেই সমস্ত লব্ধোপকার স্বীকার করি না। উন্নতির ইচ্ছা থাকিলে অন্যের উপকার করিতে চেষ্টা করা এবং লব্ধোপকার স্বীকার করিতে অভ্যাস করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

সমাজস্থ মানবের সহিষ্ণুতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ। যে সহিতে জানে, সে সমাজে থাকিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার প্রায় সকলই জানে। যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার শত্রু থাকা অসম্ভব। এই জন্যই সাধারণ কথায় বলে, বোবার শত্রু নাই।

জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। অসহিষ্ণু লোক ক্রীড়াতেও পরাস্ত হয়। যে সহিতে জানে,খেলাতেও তাহার উচ্চ স্থান। সহিষ্ণুতার সহিত অধ্যবসায়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং অধ্যয়নে সহিষ্ণুতা নিতান্ত আবশ্যক। অসহিষ্ণুর অনেক দোষ। পড়া অভ্যাস হইল না, নিজের উপর ক্রোধ হইল, পুস্তক রাগ করিয়া ফেলিয়া দিল, আর শিক্ষা করা ঘটিল না। শিক্ষকের শাসন অসহ্য, অধ্যয়নের পরিশ্রম অসহ্য ;—সে কিরূপে বড় হইবে ? অসহিষ্ণু ব্যক্তি ক্রোধপরবশ, অস্থিরমতি এবং সমাজে অবস্থান করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমরা কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই যে অতি বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবার পরমসুখে দিনপাত করিতেছে। তাহারও মূল সহিষ্ণুতা। পরিবারের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্তহৃদয় ও পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হন ; আত্মপর বিবেচনায়, লাভালাভ গণনায় তাঁহার হৃদয়ের সমতা নষ্ট না করেন, তাহা হইলে সুখস্রোত জাহ্নবী-স্রোতের ন্যায় স্নিগ্ধভাবে নিয়ত প্রবাহিত থাকে। আর যদি কর্ত্তা বিচলিত হন, তাঁহার হৃদয় কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে কোন হ্রদের এক প্রান্ত বাতাহত হইলে সমুদয় হ্রদ যেমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তেমনই সমস্ত পরিবারের

হৃদয় আলোড়িত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। পরিবার বহুবদন; সমভাবে খাদ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু যোগাইতে না পারিলে বহুবদনে বহু নিন্দাবাদ শুনিতে হয়। নিতান্ত সরল ও নির্দ্দোষভাবে কাজ করিলেও অনেক সময় অকারণ গ্লানি সহিতে হয়। তখন যে নীরব থাকিতে পারে, সে নিরাপদ। প্রতিবেশীরা কুলোক হইলে নানারূপ অলীক কথা তুলিয়া অনেক পরিবারের শান্তিনাশ করে। পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে যদি উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে ভঙ্গপ্রবণ কাচপাত্র সদৃশ একান্নভুক্ত পরিবার সেই প্রখর তেজে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়।

পরিবার সম্বন্ধে যাহা, সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই। স্বগ্রাম, স্বসমাজ, স্বদেশ এবং সমস্ত মানবসমাজের উপর এই বিশ্বজনীন নীতি প্রয়োগ কর, দেখিতে পাইবে সর্ব্বত্র এই সত্য বিরাজমান। যদি সহিতে না পার, তোমার গ্রামে তুমি অযোগ্য প্রতিবেশী, তোমার সমাজে তুমি অসামাজিক, তোমার দেশে তুমি একজন নিন্দিতলোক এবং মানবসমাজে তুমি একজন ঘৃণিত-স্বভাব ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি।

সহিষ্ণুতার সর্ব্বপ্রধান রিপু ক্রোধ। ক্রোধোন্মত্ততা সর্ব্বত্রই দূষণীয়। ক্রোধ না থাকিলেও চলে না, উপযুক্ত স্থলে ক্রোধের অভাব কাপুরুষতা। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ; তাহাকে তেজ বা পুরুষত্ব বলিলেও

হয়। সে ক্রোধও সহিষ্ণুতা এবং বিবেচনার সহিত পরিচালিত হয়। তাহাতে স্বত্ব রক্ষা করে, আপনার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। তাহা নিন্দনীয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু যে ক্রোধে মোহ জন্মায়, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, স্মৃতিবিভ্রমে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশে অনর্থের উৎপত্তি হয়, কেবল তাহাই সহিষ্ণুতার, সুতরাং সমাজের শত্রু। উকীলে উকীলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বাদানুবাদ হইতেছে; তাহাতে যে ক্রুদ্ধ হইল সেই সূত্র হারাইল, তাহার পরাজয় নিশ্চয়।

পরদুঃখকাতরতা এবং পরোপকার-বুদ্ধি সমাজস্থ মানবের না থাকিলে চলে না। মানব নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল—রোগ শোকে ক্লিষ্ট, অন্নাভাবে শীর্ণ বিশীর্ণ। দুঃখ দেখিলেই দয়ার উদ্রেক হয়। দয়া কাণে কাণে বলিয়া দেন, ইহার উপকার কর,—যেরূপে পার, সেবা শুশ্রূষা, অন্নপানীয, বস্ত্র অর্থ দ্বারা ইহার উপকার কর। যখন তুমি দয়ার উপদেশানুসারে কার্য্য কর, তখন তোমার মনুষ্যত্ব সফল। আর যদি নিতান্ত পাষাণের ন্যায় দয়ার উপদেশ হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে না দেও, তাহা হইলে তখন আর তুমি মনুষ্য নও, পশু হইতেও অধম। অন্যের দুরবস্থা দেখিয়া যে আপনাকে, অথবা আপনার প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনকে তদবস্থাপন্ন বিবেচনা করিয়া

ক্ষণেকের জন্যও সেই বিপদ অনুভব করিতে না পারে, সে হৃদয়-বিহীন। এই অনুভব শক্তির নামই সহানুভূতি।

কেবল সহানুভূতি থাকিলেই হইল না; সহানুভূতি মনে জন্মে, সে আদেশ পালন করিতে হস্ত চাই; পরোপকার সাধন না করা পর্য্যন্ত সহানুভূতির শান্তি নাই। ভাবিয়া দেখিলে সমাজস্থ মানবের পরোপকার আত্মোপকার মাত্র। কারণ সমাজ দর্পণস্বরূপ, যেরূপ দেখাও, তেমনই দেখিবে। এখানে যাহা কিছু কর, কোন না কোন রূপে তাহার বিনিময় হয়। সমাজ-বাণিজ্যে দক্ষ বণিক্ হৃদয়ের সাধুবৃত্তিনিচয় মূলধনরূপে যত সাবধানে প্রয়োগ করেন,তাঁহার লাভও তত অধিক হয়। নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার-সাধন করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, বোধ হয় মর্ত্ত্যলোকে তাহার উপমেয় আর কিছুই নাই।

এতক্ষণ সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বলিলাম; এ সকলের শীর্ষস্থানে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। নাস্তিকের আবার সমাজ কি? যাহার পরকালের ভয় নাই,ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নায়কের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে স্বীকার করে না, সে অতি ভয়ঙ্কর লোক। যদি ধরা পড়িবার এবং দণ্ডিত হইবার ভয় না থাকে, তাহা হইলে নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কোন কার্য্যই স্বার্থের অনুরোধে তাহার অকরণীয় হইতে পারে না।

যাহাতে যাহাকে ধারণ করে, অর্থাৎ যাহার বলে যে থাকে, সেই তাহার ধর্ম্ম। জড়জগতেও এ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। এই বিপদসঙ্কুল সংসারে,—যেখানে স্থলে সর্পশ্বাপদ, রোগশোক, জলে হাঙ্গর কুম্ভীর, অন্ত-রীক্ষে অশনিপাত প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান, সেখানে মানবকে ধারণ করে, রক্ষা করে কে? কাহার দিকে মন স্বভা-বতঃ ধাবিত হয়? আশ্রয় জন্য লোকে কাহাকে ডাকে? সেই অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি, অনাদিপুরুষ পরমেশ্বর সমস্তের ধারণকর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। আস্তিকতা ধর্ম্মের মূলস্বরূপ।

এক আস্তিকতা চরিত্রসংশোধনের প্রধান সহায়। যদি তাহার সহিত অনুষ্ঠান থাকে, উপাসনার কোন একটী প্রণালী যথানিয়মে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে চরিত্র গঠিত হইল, সমাজ সবল ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিল। সংসারে উপাসনার প্রণালীগত পার্থক্য বিস্তর, কিন্তু মূল সকলেরই এক।

কেবল উপাসনা মানবধর্ম্ম নয়,তাহা মনের স্থিরতা-সাধনের একটী প্রধান উপায় মাত্র। তদ্ভিন্নও অনেক ক্রিয়া আছে। প্রাণী মাত্রে অহিংসা, অবিশ্রান্ত দয়া, নিঃস্বার্থ পরোপকার, বিশ্বময় প্রীতি, ধুতুরা ফুলটির মত হৃদয়ের সারল্য, সত্যে অবিচলিত অনুরাগ, পাপে ঘৃণা, কুকার্য্যে জুগুপ্সা, সৎকার্য্যে আসক্তি,—এ সমস্তই মানব-

ধর্ম্ম; ইহাতে কোন মতভেদ নাই। যাহাতে সমস্ত বিশ্বসংসারের মত এক, তাহা যে মানবের নিত্য ধর্ম্ম এবং সংসারের নিত্য সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

সুতরাং বালকের কোমলমনে জীবনের প্রথম সময়ে ধর্ম্মবীজ রোপণ করা অভিভাবকের পবিত্র কর্ত্তব্য। সৎশিক্ষার নিমিত্ত প্রথমে সাবধান হইলে বালকের বিপথগামী হইবার আশঙ্কা অল্প। সুদক্ষ শকটচালক যেমন অশ্বরজ্জু সাবধানে ধরিয়া, অতি সঙ্কীর্ণ পথেও শকট চালাইতে সমর্থ হয়, তাহার কৌশ-লের নিকট পথের দুর্গমতা পবাজয় স্বীকার করে, তেমনই সুদক্ষ গুরুর হস্তে শাসনরজ্জু থাকিলে, বালক নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে পারে না, দুর্গম বর্ত্মও তাহার সুগম হয়। অতএব সুশীল বালক! গুরুর উপদেশে মন দেও; তোমার চরিত্র শারদীয় জ্যোৎ-স্নার ন্যায় নির্ম্মল, যশ বসন্তের কুসুমবাসের ন্যায় মনোমদ এবং জীবন শিশুর হাস্যের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সুখকর হইবে। সামাজিক শিক্ষার এই মুল সুত্র, এই শেষ লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

মিতব্যয়িতা ও মিতাচারিতা।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী প্রবন্ধে, বালক কি উপায়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, সামান্য শ্রেণীর আহারনিদ্রাপরায়ণ আলস্যপরতন্ত্র লোকদিগকে নিম্নে রাখিয়া মনুষ্যলোকে উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে মিতব্যয়িতা ও মিতাচারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

অর্থ উপার্জ্জন করিলেই মনুষ্যের কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তাহার সদ্ব্যবহার চাই। উপার্জ্জন করা অপেক্ষা সদ্ব্যবহার করা অনেক কঠিন। অর্থ যেমন জগতের পরমোপকারী বিনিময় বস্তু, সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধক, আচারব্যবহারদোষে তেমনই তাহা সংসারের পরম শত্রু। অর্থই জগতের স্বার্থ, আবার অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল।

মুদ্রা চক্রাকার; চক্রের ন্যায় সংসারে নিয়ত ঘূরিতেছে, আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়-পথে সকলে তাহার অনুসরণ করিতেছে। অর্থশালী লোক সংসারে ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান্, সুচতুর, সদ্বক্তা। বিদ্যাবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার অভাব অর্থে ঢাকিয়া রাখে। যেখানে অর্থ, সেখানে

অনেক অনুচর, সেবক, স্তাবক, চাটুকার; সুতরাং সমস্ত জগৎ ধনবানের গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত। আর যেখানে অর্থের অভাব, সেখানে সকলেরই অভাব। তুমি যত কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, সদ্বক্তা না হও, তুমি দরিদ্র হইলে কেহ তোমার গুণ দেখিবে না। অর্থ জগতের আলো; যে ঘরে সে আলো আছে, সে ঘরের সকলই সুন্দর; যে ঘরে তাহা নাই, সে ঘরে সব অন্ধকারাবৃত, অদৃশ্য; সুতরাং কিছুই নাই। অরণ্যে গোলাপপুষ্পের শোভা সৌরভ কে প্রশংসা করে? সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন রত্নরাশির মূল্য কে অনুভব করে? সমুদ্রের লহরী যেমন যেখানে জন্মে সেইখানেই লীন হয়, দরিদ্রের গুণরাশিও তেমনই যেখানে জন্মে সেইখানেই মিশিয়া যায়। সুতরাং কবি বলিয়াছেন ঃ—

"দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

অর্থের স্থলাস্থল নাই, কে পাপী, কে পুণ্যবান্ তাহাও বিবেচনা নাই; কিন্তু সাধারণতঃ সাধু সদাশয়ের হস্তে গেলেও অনেকক্ষণ থাকিতে কুণ্ঠিত। আবার বসারঞ্জিত ঘাতুকের, শোণিতসিক্ত হত্যাকারীর, হৃদয়-বিহীন দস্যু বা সেনাপতির, নির্দ্দয় রাজার, কৃপণ বণি-কের হস্তও তাহার অতি প্রিয়

অর্থ যে কেবল প্রয়োজনসাধক তাহা নহে, পরোপ-কারব্রতের এমন সহায় আর নাই। যে কোন প্রকারে

হউক, অর্থদ্বারা পরদুঃখ বিমোচনে সমর্থ হওয়া যায়। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে শীতাতপ হইতে সংরক্ষণ. নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, জলশূন্য স্থানে জলাশয় খনন, দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন, অসভ্যকে সভ্যকরণ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমস্তই অর্থসাধ্য। অর্থবল বড় প্রধান বল। অর্থ দয়ালুর মনোবৃত্তির চরিতার্থসাধক, কৃপণের হৃদয়-সর্ব্বস্ব, সংসারের আশ্রয়। আবার অযোগ্য হস্তে সেই অর্থ হলাহলাপেক্ষাও ভয়ানক।

কৃপণ পিতা বহুযত্নে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সঞ্চয় তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অর্থসংগ্রহ করিতে কোন কার্য্যই তিনি নীচ মনে করেন নাই, শরীরের দিকে একবারও তাকান নাই, উপযুক্ত সময়ে বা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করাও ঘটে নাই। আপনার স্ত্রী পুত্র উত্তরকালে সুখভোগ করিবে, কেবল এই জন্য তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু হায়! তাঁহার অগঠিত-চরিত্র তনয় উপার্জ্জনের কষ্ট পায় নাই, অর্থ যে দুর্ল্লভ তাহা তাহার মনেও হয় নাই; তাহার হস্তে অনায়াস-লব্ধ লক্ষ মুদ্রা। ব্যয়ের কি কি উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তাহার এই মাত্র চিন্তা। পথপ্রদর্শকের অভাব নাই; কারণ ধনিলোক সংসারে কখনও সঙ্গিহীন

নহে। কুলোক আর মাছি সর্ব্বদা চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া বেড়ায়, খাদ্যের গন্ধ পাইলে অমনি বসিয়া পড়ে। বর্ব্বর ধনীর অনেক বন্ধু। যাহা কিছু আপাতঃ সুখকর, যাহা কিছু ধূমধাম পরিপূর্ণ, তাহাই অবলম্বিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে অর্থ উড়িয়া গেল, অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মক্ষিকারূপ বন্ধুগণও স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তখন রহিল কি? অন্নাভাবে ক্লেশ, অনিয়মজনিত রোগ, আর অনুতাপ! দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল, হতভাগ্য ধনিসন্তান বৃদ্ধা জননীর ক্রোড়শূন্য করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিল, তাহার সন্তানসন্ততি অপার দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিল।

আবার একজন দরিদ্র উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা দত্তকরূপে হঠাৎ বড়মানুষ হইল। তাহার চরিত্র কিয়ৎপরিমাণে গঠিত। সে পাপানুষ্ঠান করে না, পাপপরায়ণ সঙ্গিগণও আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে নাই। কিন্তু সে অর্থের ব্যবহার শিক্ষা করে নাই। নামের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছে। বিশুদ্ধ আমোদের জন্য সে ঘোড়ার নাচ, নাট্যাভিনয় প্রভৃতিতে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। অপব্যয়ী বন্ধুকে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করিতেছে; অথবা বিড়ালের বিবাহে, বানরের বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা উড়াইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে আতোষ-

বাজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সব নিঃশেষ হইল। ভূতপূর্ব্ব কোটিপতি এখন পথের ভিখারী। উপকারপ্রাপ্ত বন্ধুগণ তাহার সহিত এখন আলাপও করে না।

আবার একজন প্রথম জীবনে ক্লেশ করিয়া অতি সাবধানে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিল। আপনাকে কোটীশ্বর মনে করিয়া মনে তাহার অহঙ্কার জন্মিল। সেই অর্থ পরপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হইল। তাহার ইচ্ছার প্রতিকূল হইয়া শত শত লোককে নিরন্ন হইতে হইল। উপাংশুহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতিও তাহার নিকট ঘৃণিত কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইল না। তাহার পাশবরৃত্তিনিচয়ের চরিতার্থতাসাধনার্থ কত নির্ম্মলচরিত্র সদাশয় ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। মানীর অপমান,জ্ঞানীর কারাবাস, বৃদ্ধের অসম্মান তাহার সুকার্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবেশীর ধনাপহরণে শত শত উপায় উদ্ভাবিত হইল। সুতরাং জীবনরক্ষক, পরোপকারসাধক অর্থ নরপিশাচ পাষণ্ডের হস্তে পরপীড়নযন্ত্র হইয়া জগ-তেব অশেষবিধ অনিষ্ট সংসাধন করিতে লাগিল।

যে কেহ স্থিরচিত্তে লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই দেখিবে এ সকল কথায় অত্যুক্তি নাই। কেহ ভ্রান্ত-ধর্ম্মবুদ্ধিতে অগণিত অর্থ উড়াইয়া দিয়া শেষে পরের দাসত্ব করিতেছে; কেহ অসৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব নিঃশেষ করিয়া মহাকষ্টে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে;

কেহ বা পথের বালুকা গোলাপ্জলে সিক্ত করিয়া, নিত্য নূতন বিলাসবর্ত্ম আবিষ্কার করিয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছে। সংসারে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বাস্তবিক, অর্থের সদ্ব্যবহার অতি সুখকর। তুমি স্বয়ংই উপার্জ্জন কর, অথবা তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ পুরুষের উপভোগ জন্য অর্থসঞ্চয় করিয়া রাখিতে দয়াবান্ পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্বপুরুষগণকেই তোমার অগ্রে পাঠাইয়া দিউন, যদি তুমি তোমার আয় এবং ব্যয় একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালন করিতে পার, তাহা হইলে জীবন সুখে যাইবে সংশয় নাই। এ কথা সত্য যে, সংসারে যাহাদের আহার্য্য যোটে না, উপযুক্ত পরিমাণে উদরান্ন সংগ্রহ করাও ঘটে না, এরূপ হতভাগ্য অনেক আছে। আবার বহু পরিবারের প্রতিপালক, অথচ অল্প উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও ন্যূন নহে। তাহাদের ব্যয় নিয়মাধীন করা যায় না। কিন্তু সংসারে ধনাগমের বহু পথ বর্ত্তমান আছে। তাহারাও ইচ্ছা করিলে জীবিকানির্ব্বাহের সহজ পথ বাছিয়া লইতে পারে এবং আপন কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন করিতে পারে। দুঃখ অলসের জন্য, দুঃখ ভীরুর জন্য, দুঃখ কাপুরুষের জন্য।

কে কি নিয়মে চলিতে সমর্থ, তাহা প্রত্যেকের নিজের এবং পারিবারিক অবস্থার প্রতি নির্ভর করে।

কেহ শতকরা নব্বই টাকা সঞ্চয় করিতে সমর্থ; কেহ পাঁচ টাকাও পারে না। যে অর্থ দ্বারা অনায়াসে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে, যদি আয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক সঞ্চয় হইবে। অনেক দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি আয় ব্যয়ের নিম্নলিখিত হিসাব অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমাবধি সাবধান হইয়া চেষ্টা করিলে তাহা অনেকাংশে সাধন করিতে পারে।

নিজের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বার্ষিক আয়ের ...	১/৪
পরিবারস্থ অন্যান্যের জন্য	১/৪
দানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অতিথিসেবাদি	১/৪
সঞ্চয়	১/৪
	১

অবস্থানুসারে প্রথম ৩/৪ অংশ সম্বন্ধে অনুপাতের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সঞ্চয়ের ১/৪ অংশ স্থির থাকা উচিত। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রথম দুইটির অনুপাত রক্ষা বড় কঠিন; কিন্তু যাহার হিসাব আছে, সে চতুর্থটি ঠিক রাখিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক চারি বৎসর উপার্জ্জনের পর এক বৎসরের আয় সঞ্চিত হয়। হঠাৎ রোগের অত্যাচারে বা অন্যবিধ কারণে উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে সে সময়ে প্রাণ রক্ষার পথ থাকে। সুতরাং জীবনে চব্বিশ বৎসর উপা-

র্জ্জন করিলে ছয় বৎসর কাল সুখে কাটাইবার, অথবা পুত্রাদির জন্য কিছু সংস্থান রাখিবার উপায় হয়।

মিতব্যয়িতা কি? মিত শব্দ মা ধাতু হইতে উৎপন্ন; মা অর্থ মাপ করা। যাহার ব্যয় মাপা অর্থাৎ ঠিক নিয়মে ঠিক পরিমাণে হয়, সেই মিতব্যয়ী। একদিনে দশ টাকা ব্যয়েও তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু দৈনিক ব্যয়ে একটী পয়সা বাঁচাইতে পারিলেও অনেক লাভ। কারণ যে দৈনিক ব্যয়ে এক পয়সাও হিসাব করিতে জানে, তাহার অপব্যয়ী হইবার সম্ভব কম। যে দৈনিক বাজার খরচে চারিটী করিয়া পয়সা রাখিতে পারে, তাহার বৎসর ২২৸৴০ টাকা থাকে। যে চারি আনা দৈনিক রাখিতে পারে তাহার বৎসর ৯১।০ টাকা সঞ্চয় হয়। সঞ্চয়ের নিয়ম এই। এই সামান্য সঞ্চয়ও যদি বিশ বৎসর ব্যাপিয়া চলে, তাহা হইলে যে বৎসর ২২৸৴০ টাকা সঞ্চয়ে সমর্থ, তাহার ৪৫৬৷০ এবং যে ৯১।০ টাকা সঞ্চয়ে সমর্থ, তাহার ১৮২৫৲ টাকা সঞ্চয় হইল। আবার এই টাকার যদি সুদ চলিতে থাকে তবে আরও অধিক হয়।

ব্যয়ের সম্বন্ধে সামান্য বিষয় হইতে অতি গুরুতর বিষয় পর্য্যন্ত যেমন দৃঢ় নিয়ম ও হিসাব থাকা আবশ্যক, জীবনের অন্যান্য বিষয়েও ঠিক তেমনই নিয়ম থাকা উচিত। একদিন অধিক, একদিন অল্প আহার করিলে জীর্ণ হইবে না। একদিন সামান্য খাদ্য, অন্যদিন পলান্নাদি

ভক্ষণ, একদিন দশটার সময়, অন্যদিন তিনটার সময় আহার করা, একদিন তিন বার, এক দিন একবার মাত্র খাদ্যবস্তু উদরস্থকরণ, এ সমস্ত শারীরিক অনিয়ম। যাহারা এইরূপ অমিতাচারী, তাহাদের অল্পায়ু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব প্রিয় বালক! জীবনের প্রথমাবধি সতর্ক হও, যেন এইরূপ অযথা ব্যবহার দ্বারা জীবন অকর্ম্মণ্য না হয়; যেন অনিয়মিত আচরণ দ্বারা আপনাকে আপনি অল্পায়ু করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য বিফল না কর।

পরিশ্রমের অনিয়মও সামান্য অনিয়ম নহে। কি শারীরিক, কি মানসিক, পরিশ্রমের যে নিয়ম জীবনের প্রথম অবধি চালাও, শেষ পর্য্যন্ত সেই এক ভাবে পরিচালন করা কর্ত্তব্য। কারণ অভ্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা; অভ্যাস ও প্রকৃতি এক হইয়া চলে। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের অনিয়মে অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সমস্ত বৎসর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিয়া কেহ কেহ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমনই পরিশ্রম করে যে, তাহাদের শরীর রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সময় পরীক্ষা দেওয়াও ঘটে না; অথবা অল্প সময়ে মনে অধিক বোঝা চাপাইতে চেষ্টা করাতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। কেহ বা জিদ করিয়া একদিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, আবার পরদিন সমস্ত দিন ঘুমাইয়া থাকে। কেহ বা যাত্রা গান

শুনিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিল, অভিভাবকের ভয়ে দিনেও ঘুমাইল না; জাগরণজনিত অসুখ তাহাকে উন্মনস্ক করিল, অথবা তদ্দ্বারা তাহার কোন পীড়া জন্মিবার সূত্রপাত হইল। এ সমস্ত নিতান্ত দূষণীয়। দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যনাশক নাট্যাভিনয় দর্শন বা যাত্রাগান শ্রবণ অধ্যয়নশীল বালকের জন্য নয়। তাস পাশা প্রভৃতি অলস ক্রীড়া হইতে দূরে থাকা বালকের কর্ত্তব্য। বালক অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে, যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে; যথাসময়ে আহার করিয়া অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিবে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরীর-সঞ্চালনকরী ক্রীড়া, কিঞ্চিৎ পর্য্যটন, অথবা অঙ্গসঞ্চালনজনক অন্য কোন কার্য্য করিবে। সন্ধ্যার পর হইতে শরীরের অবস্থা ও অধ্যয়নের প্রয়োজনানুসারে অধ্যয়ন করিবে। নিদ্রা যেন ছয় ঘণ্টার ন্যূন না হয়; যাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ছয় ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল নিদ্রিত থাকাও দূষণীয়। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা এ নিয়মেরও ইতরবিশেষ হয়। নিয়মাধীন হইয়া এ সমস্ত কার্য্য করিলে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইবে না, স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বৃথা আলাপে সময় ব্যয় করিতে অভ্যাস করিলে চিত্ত লঘু হইয়া পড়ে, মনের ধারণাশক্তি থাকে না। নিজের সহিত যাহার বয়সের সমতা নাই

এরূপ বালকের সহিত কদাচ খেলা করিবে না, বা বেড়াইবে না। সমবয়স্ক ব্যতীত অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে না। করিলে অনেক দোষ। সেও অমিতাচার। যাহারা সমবয়স্ক, সমপাঠী ও সমরুচি-বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব থাকা উচিত।

সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের পরিবর্জ্জন মিতাচারের আর একটি প্রধান অঙ্গ। মাদকে মত্ততা জন্মায়, সুস্থ মস্তিষ্ককে বাতুল করিয়া তুলে। উন্মত্ততা যখন এমন ভয়ঙ্কর রোগ, তখন সাধ করিয়া ইহার উৎপত্তি করা মূর্খের কার্য্য। আজকাল তামাকের ধূমপান অনেক ছাত্রের নিকট দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু তামাকও যে এক প্রকার মাদক তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি কেহ প্রতিদিন তামাকের জন্য দুই পয়সা হিসাবে খরচ করে, তাহা হইলে বৎসরে তাহার প্রায় ১২৲টাকা পুড়িয়া যায়। এই টাকায় কত সৎকার্য্যের সাধন হইতে পারে, কত নিরন্ন আহার করিয়া সুস্থ হইতে পারে, কত বস্ত্রহীন বস্ত্র পরিয়া শীতের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, কত ভাল পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধির উপায় হইতে পারে, তাহা একবার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।
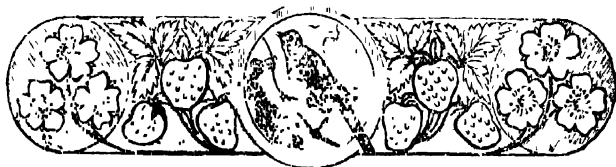
চতুর্থ অধ্যায়

স্বাবলম্বন।

মনুষ্য স্বাধীনতার অভিমান করে; অধীন হইতে ভালবাসে না। সকলেরই গুরু হইতে বাসনা, কেহই লঘু হইতে চায় না। প্রভু হইতে একান্ত ইচ্ছা, ভৃত্য হওয়া সকলেরই অনভিমত। আমি যখন এই কয়টী কথা চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয় "মনুষ্য কি কপট, তাহার মিথ্যা কহিতে অণুমাত্র লজ্জা হয় না।" কারণ, আমরা কার্য্যে দেখিতে পাই স্বাধীন হইবার বাসনা অতি অল্প লোকের; গুরু, প্রভু হইবার বাসনা অতি অল্প সংখ্যক লোকের মাত্র। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক শান্তিময় অধীনতায়, উপদ্রবহীন লঘুত্বে ডুবিয়া থাকিত না।

কত সহস্র বৎসর হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিরাজমান এ কথা কেহ অবগত নহে। কত কাল

হইতে পর্ব্বত পারাবার প্রভৃতি বর্ত্তমান তাহাও কেহ জানে না। কোন সময় মনুষ্যের সৃষ্টি, কখন মানবমনের বিকাশ তাহাও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কোটি কল্প ব্যাপিয়া এ সমস্ত বর্ত্তমান আছে এ কথা বলিলেও কেহ তাহা প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিতে পারে না। সে সমস্ত বিষয় এখন আলোচনার বিষয় নহে। এ কথা নির্দ্দেশ করা যায় যে, এই বিশাল ভূভাগ, অত্যুন্নত পর্ব্বত, সুদূর-গামিনী নদী, বহ্বায়ত সমুদ্র, শ্যামল ক্ষেত্রনিচয় পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই সমস্ত সামগ্রীই উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোন স্বতন্ত্র সম্পত্তি ছিল না। সুখসাধনসামগ্রী, বিলাসবস্তু দিন দিন বাড়িতেছে, কমিতেছে না। তবে আমাদের মনের স্বাধীনতা নাই কেন? মন এত ভীরু কেন? পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহা পারিব না বলিয়া অবসন্ন হই কেন? আমাদের ভীতিবিহ্বল মনে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা, আর আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। স্বাধীনভাবে কোন কথা বলি না, কার্য্য করি না; পূর্ব্বপুরুষগণের লিখিত কোন বচন উদ্ধৃত না করিলে, আমাদের কথা, লেখা কিছুই শুদ্ধ হয় না। আমাদের প্রতি, আমাদের বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, গৌরবের প্রতি, আমাদের এতই অবিশ্বাস! তৎসম্বন্ধে আমরা এতই নাস্তিক। আমরা ভাষা চুরি করি, ভাব

চুরি করি ; চুরি করিয়া আবার গর্ব্বিত হই। আমাদের নিজের যেন কিছুই নাই। চন্দ্রসূর্য্য আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ আলোক উৎসাহ দান করিলেও আমরা সবল নহি। মানবের আদিপুরুষ প্রথমে নয়ন মেলিয়া যে সূর্য্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া ভক্তি ও পুলকে পূর্ণ হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, আমিও নয়ন মেলিয়া সেই সূর্য্যই দেখিতেছি ; তবে ভাবগত এ বৈষম্য কেন ? তাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে যে ভাব-স্রোত উথলিয়া উঠিয়াছিল, আমার তাহা হয় না কেন ? সকলই এক ;—সেই হস্ত, সেই পদ, সেই শরীর, সেই মন। কেবল একটী পদার্থে ইতরবিশেষ। তাঁহাদের প্রভুত্ব, গুরুত্ব ছিল, আমাদের নাই, তাঁহাদের স্বাবলম্বন ছিল, আমাদের নাই, এই মাত্র। তাঁহারা দীনমনা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনগুণে ভাবরত্ন অর্জ্জন করিয়া মনকে বড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এ যুগের মন ধনীর সন্তান, স্তূপাকার ভাবরত্ন রহিয়াছে, উপার্জ্জনের প্রয়োজন অল্প ; বোধ হয় সেই জন্যই আজ মনের উপার্জ্জনক্ষমতা এত সামান্য হইয়াছে।

যাঁহারা স্বচিন্তা দ্বারা এ সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মন স্বাধীন ছিল। আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করি না, সেই সমস্ত ব্যবহার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকি, কাজেই আমাদের মন তাঁহাদের অধীন।

মনোরাজ্যে তাঁহারা গুরু, আমরা শিষ্য ; তাঁহারা প্রভু, আমরা ভৃত্য ; সুতরাং আমরা তাঁহাদের পদানত।

সংসারের সমস্ত রত্নই কি লুন্ঠিত হইয়াছে ? এত অল্প কালেই কি পৃথিবী পুরাতন এবং ভাবশূন্য হইল ? এ কালে কি প্রতিভা সত্য সত্যই বিরল ? এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, কপিল, গৌতম অনেক কালের লোক, হোমর, ভর্জ্জিল, প্লেটো, এরিষ্টটলও অনেক কালের লোক। কিন্তু সে দিনও ত বসুন্ধরা সেক্ষপীয়র, মিল্টন, বেকন, নিউটন, গেটে, কোমত প্রভৃতি প্রসব করিয়াছেন। তবে আমাদের দেশের এখন এ অবস্থা কেন ?

এ সকলের মূলেও অনুসন্ধান করিলে সেই একটী মাত্র কারণ দেখিতে পাইব। অন্য দেশে স্বাবলম্বন আছে, আমাদের তাহা নাই। অন্য দেশ বৃক্ষের ন্যায় আপনার তেজে আপনি উপরের দিকে উঠিতেছে, আর আমরা লতার ন্যায় ভূতলে পতিত, অবলম্বন ব্যতীত উঠিতে পারি না। বাস্তবিক স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বন ব্যতীত কেহ কখনও সংসারে গুরু বা প্রভু হইতে পারে নাই, পারিবেও না। যখন এ দেশের গৌরব ছিল, তখন স্বাবলম্বনও ছিল।

আমরা যে প্রাচীন ছাত্রে এবং বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রে বিস্তর বৈষম্য লক্ষ্য করি, তাহার মূলে, পূর্ব্বকালের

ছাত্রদিগের অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বন ছিল বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইহাই উপলব্ধ হয়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, ছাত্রের স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীনচেষ্টা সম্বন্ধে আজ তাহাও নাই। এখন অর্থপুস্তকের অসদ্ভাব নাই, অভি-ধানের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্রমেই শব্দ-সম্পত্তিতে ছাত্রগণের অধিকার-হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আজ গৃহে গৃহে শিক্ষাদানজন্য স্বতন্ত্র শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে; ছাত্রের নিজের চেষ্টায় আজ প্রত্যেক বিষয় 'অসাধ্য', 'অসম্ভব'। আলস্য-প্রধান ছাত্র-জীবনে আজ যুগান্তর উপস্থিত;—যুগান্তর বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অবনতির দিকে। "এই কার্য্য আমি করিব, নিশ্চয় পারিব, অন্যের সাহায্য লইব না," অধিকাংশস্থলে আজ এ সঙ্কল্প, এ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না। অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। কয়জন অভিভাবক, কয়জন শিক্ষক তাহার প্রতিবিধান-জন্য যত্ন করিতেছেন? যিনি এ দোষ সংশোধনে প্রয়াস না পান, তাঁহাকে প্রকৃত অভিভাবক বলা যায় না। যিনি বালককে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন শিক্ষাদানে সমর্থ, তিনিই গুরু, অন্যের গৌরব নাই।

স্বাবলম্বন বড় গুরুতর বিষয়, মনুষ্যত্বের দ্বারস্বরূপ। সংসারে যাহা কিছু হইয়াছে সে সমস্তই স্বাবলম্বনের

ফল। গ্যালিলিও, আর্কিমিদিস, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াট্, আর্করাইট্, ইহাঁরা সকলেই স্বাবলম্বনগুণে জগদ্বিখ্যাত।

প্রতিভা স্বাবলম্বনের স্বর্গীয় জ্যোতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি আপনার মনকে ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করে, সে সেই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন-পূর্ব্বক কৌস্তুভরত্নের ন্যায় অমূল্য রত্নরাশি উৎপাদনে সমর্থ, অন্যে নহে। সমস্ত রত্ন ঐ একস্থানেই আছে, যে উদ্ধার করিতে পারে সেই এই মর্ত্ত্যলোকে অমর, আর সকলের জীবন বায়ুরাশিতে অঙ্কিত শায়ক-মার্গের ন্যায় চিহ্নহীন ও বিস্মৃত।

আজ সংসার যন্ত্রময় দেখিতেছি ;—কেবল হস্তের সাহায্যে কার্য্য কেবল অসভ্যের জন্যই রহিয়াছে। ইয়োরোপ মুক্তহস্তে পূর্ব্বাভিমুখে যন্ত্রের পর যন্ত্র প্রেরণ করিতেছেন, আমরা হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া ইয়োরোপ-বাসীর মনীষার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কোন মন্ত্র নাই, দৈববল নাই। এ সমস্তই স্বাবলম্বন-প্রসূত। ইহার এক একটির জন্য সামান্য চিন্তা, সামান্য অধ্যবসায় ব্যয় হয় নাই। কত জীবন কাটিয়া গিয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই। দুর্দ্দমনীয় স্বাধীন মন, অসাধ্যসাধনক্ষম অধ্যবসায়, আপন শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, দীর্ঘকালব্যাপি-শোণিতশোষি-চেষ্টা এবং গুণ-

গ্রাহী রাজা ও রাজপুরুষগণের উৎসাহ, এ সমস্ত মিলিত হইয়া এক একটী যন্ত্রের আবিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে।

ফরাসী দেশের সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি অতি সামান্যাবস্থা হইতে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কি অসামান্য স্বাবলম্বন, কি অত্যুৎকৃষ্ট আত্মশিক্ষা, কি অসাধারণ স্বচিন্তাদ্বারা তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সৎশিক্ষা তাঁহার উন্নতির মূল বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেন। যে বয়সে অন্য বালক ক্রীড়াসক্ত, তখন তিনিও ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু ক্রীড়ায় ক্রীড়ায় বিস্তর প্রভেদ। নেপোলিয়ন একজন সৈনিক পুরুষের সন্তান, সংগ্রাম তাঁহার ব্যবসায় হইবে তাহা প্রথম হইতেই জানিতেন। সুতরাং যে সময়ে সামান্য বালকগণ সামান্য ক্রীড়া করিত, তখন নেপোলিয়নের ক্রীড়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন, তুষার দ্বারা দুর্গ নির্ম্মাণ, আবার সেই দুর্গ রক্ষা করা ও জয় করা, অধীন কোন ক্রীড়া-সৈন্য আদেশের অন্যথা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান, ভূমধ্যস্থসাগরের সমস্ত অংশের গভীরতা নির্ণয় ও জলের অবস্থা-পরিজ্ঞান। সুতরাং সামান্য ক্রীড়কগণের সংসার-জীবনের ক্রীড়া সামান্যই হইল; আর নেপোলিয়নের ক্রীড়া সাম্রাজ্য-গঠন, সাম্রাজ্য-বিলয়, ইয়োরোপ-সংস্কার, পৃথিবী-সংস্কার, নূতন সমর-শাস্ত্র ও

নূতন ব্যবহারশাস্ত্রের প্রণয়ন, পৃথিবীকে নবজীন-প্রদান। তাঁহার এমনই অসাধারণ স্বাবলম্বন, এমনই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং এমনই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহার এক একটী কথা আজও দৈববাণীর ন্যায় মনীষিগণের কর্ণে ধ্বনিত হয়। কি রাজসভায়, কি সৈনিকশিবিরে, কি সংগ্রামক্ষেত্রে, কি পণ্ডিতসমাজে, কি সাধারণ লোকের সহিত সদালাপে, নেপোলিয়ন সর্ব্বত্র পূজনীয়, সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশে তাঁহার জন্ম হইলে তাঁহার শক্তি দৈবশক্তি এবং তাঁহাকে অবতারস্বরূপ মনে করিয়া লোকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। স্বাবলম্বন ঐ দৈবশক্তির মূল।

স্বাবলম্বনে মনকে যেমন বলবান্ করে, তেমন আর কিছুতেই নহে। পণ্ডিত গ্যালিলিও বুঝিলেন সূর্য্যের গতি নাই, পৃথিবী প্রতিনিয়ত ঘূরিতেছে। সাধারণের সমক্ষে এই বিশ্বাসবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। নির্দ্দয় রাজপুরুষগণ উপহাস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এখন কেমন?' তিনি পৃথিবীতে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "এখনও পৃথিবী ঘূরিতেছে।" সক্রেটিস্ রাজাজ্ঞায় বিষপান করিলেন, তথাপি একেশ্বরবাদিত্ব পরিত্যাগ করিলেন না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কোন দেশে

যে কোন চিন্তাশীল মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের জীবনই স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতিও স্বাবলম্বনের সন্তান।

শিক্ষার পথ দুইটী, আত্মাবলম্বন এবং অন্যাবলম্বন। তন্মধ্যে স্বাবলম্বন উৎকৃষ্টতর এবং স্বাধীন পথ; তাহাতে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; তাহার ফল প্রতিভার বিকাশ, নূতন বিষয়ের আবিষ্কার, জগতের শিক্ষাগুরুত্ব। এই উচ্চ আসন লাভ করিতে যাহার প্রকৃত আগ্রহ জন্মে, সে তাহা লাভও করে। কারণ সিদ্ধি কখনও সাধনার অতীত নহে। যাহার যাদৃশ ভাবনা, তাহার ফললাভও তাদৃশ। জগদীশ্বর মানব-মনে এমন কোন আশা, কোন বাসনা, কোন বৃত্তিই দেন নাই যাহা চরিতার্থ করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইচ্ছার উদ্রেকও সামান্য কথা নহে, তাহাও একটী সাধনা। সেখানেও অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। মন যে কোন নূতন সদনুষ্ঠান করিতে চায়, যে কোনরূপ আবিষ্কার বাসনা করে, মনের সেই সরল অভিলাষটীকে নিয়ত সজীব রাখা, পোষণ করা, সেই চারাটী জন্মিবামাত্রই নিয়ত তাহাতে উৎসাহবারি সেচন করা, বিঘ্নবিপত্তির কীট সমস্ত তাহা হইতে বিদূরিত রাখা কর্ত্তব্য। অভিলাষটী সজীব থাকিলে মন তাহার সাধনোপায়

কদাচ বিস্মৃত হয় না। সুতরাং চেষ্টায় ঈপ্সিতফল লাভ হয় এ কথা ধ্রুব সত্য।

পরাবলম্বন শিক্ষার নিকৃষ্ট পথ। ইহার ফল অনুকরণ। যাহা আদর্শ, অনুকরণ অতি উৎকৃষ্ট হইলেও প্রায়শঃ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। তুল্য হইলেও তাহাতে প্রশংসা নাই; কারণ যাহা ছিল তাহাই রহিল, উন্নতি হইল না।

কিন্তু তাহা বলিয়া পরাবলম্বনও ত্যাজ্য বা ঘৃণার্হ নহে। বালক যখন প্রথম হাঁটিতে অভ্যাস করে, তখন অন্যে তাহাকে না ধরিলে চলে না। একবার হাঁটিতে শিখিলে শেষে লম্ফন, ধাবন, ইচ্ছামত গমনাগমন আর শিখাইয়া দিতে হয় না। অন্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমতঃ মন প্রস্তুত হয়, মন যখন হাঁটিতে শিখিবে তখন স্বাবলম্বন-পথে তাহাকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেও। পর্য্যটন, ধাবন,উল্লম্ফন যেরূপেই হউক, মন আপনার গন্তব্যস্থানে আপনি পঁহুছিবে।

অধ্যবসায়শীল মানব পরাবলম্বনেও বিস্তর উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। ইয়োরোপের যন্ত্রবিজ্ঞানের ইতিহাস এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিবে। ফরাসীজাতির প্রতিভা অতুল্য। তাহারা অনেক নূতন যন্ত্র, নূতন কৌশল আবিষ্কার করে। ফরাসী আবিষ্কার করে; কিন্তু তাহার অধ্যবসায় ইংরাজের তুল্য নহে; ইংরাজ তাহা শিক্ষা

করিয়া লইয়া তাহার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। উত্তর-কালে অনেক বিষয়ে দেখা যায়, ফরাসীর যন্ত্র হইতে ইংরাজের যন্ত্র অধিক সুন্দর, অধিক কার্য্যকর। ইংরাজের আবিষ্কারক্ষমতাও প্রশংসনীয়।

মনের এই স্বাধীনতাই মনুষ্যত্ব; মনের ঈদৃশ বলই প্রকৃত বল। পৃথিবীর সমস্ত অভিনব অনুষ্ঠান, সমস্ত সৎকার্য্য এইরূপ স্বাধীন চিন্তা এবং মানসিক-শক্তি-সঞ্জাত। শারীরবলের আদর যে পরিমাণে হ্রাস হইয়া আইসে, মানসবলের আদর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর বাল্যকালে, বিজ্ঞানের জন্মের পূর্ব্বে শারীর-বলের আদর। যেমন এক দিকে সূর্য্য উদয় হইলে ছায়া তাহার বিপরীত দিকে গমন করে, তেমন সভ্যতার আলোকের সমক্ষে শারীরবল তিষ্ঠিতে না পারিয়া বিপরীতদিকে, অসভ্য বন্য জাতির সমীপে পলায়ন করে।

চিন্তাশীল মনের আদর অনেক অধিক; সুতরাং যেখানে মস্তিষ্ক, সেখানে পূজা। বড় বড় রাজমন্ত্রী, প্রধান প্রধান বিচারপতি, খ্যাতনাম্না সম্রাট্ বা পণ্ডিত তজ্জন্য সংসারে পূজিত। এখনও দেশে দেশে কত মন বর্ত্তমান আছে, কে তাহাদিগকে পূজা করে?—ভক্তিশ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি দ্বারা মনের সুখে অর্চ্চনা করে? আজও সংসারে কর্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের আদর অধিক।

বালক! আজ তুমি প্রফুল্লচিত্তে ভবিষ্যৎমুকুরে বদ্ধ-দৃষ্টি, আজ তুমি ইতিহাসরূপ নেত্রদ্বারা অতীতচিত্র দেখিতেছ, জ্ঞানী অধ্যাপক তৎসমস্ত তোমার নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন; তুমি বালক হইয়াও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের ন্যায় সকল দেখিতেছ, বুঝিতেছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, পৃথিবীর সকল রত্ন তোমারই মনের খনিতে নিহিত, সকল জ্যোতি তোমার মানস-সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক মাত্র। যতই তোমার শক্তিতে তোমার বিশ্বাস হইবে, যতই তোমাকে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিবে, ততই আপন ক্ষমতা বুঝিবে এবং আপাত-অসাধ্য সাধন করিয়া আপনিই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। আপন শক্তিতে বিশ্বাসকে গর্ব্ব বা অভিমান বলিয়া ভ্রম করিও না। গর্ব্বে লোককে উপহাসাস্পদ করে, অভিমানে কৃতাবমাননার প্রতিশোধ দেয়। আর আপন শক্তিতে আপনার বিশ্বাস উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়।

সুতরাং বালক! তোমার কোমলমনে আপনার শক্তিতে আপনার বিশ্বাস রাখিতে হইবে; যদি তাহা না পার, তুমি স্বচিন্তা বা স্বাবলম্বনে সমর্থ হইবে না। ভীরুব্যক্তি অন্ধকারে একাকী গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না, তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন। মানসিক শক্তিতে ভীরুব্যক্তি স্বচিন্তায় কোন কার্য্য করিতে সাহস পায়

না। তাহার পক্ষে অন্য ব্যক্তির শক্তির সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং সে পুস্তক-লিখিত বিষয় সত্য বলিয়া সত্য জ্ঞান করে, তাহার গুণে মুগ্ধ এবং দোষানুসন্ধানে অসমর্থ হয়। সে আপনাকে সতত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে পরিণত হয়।

তাহা বলিয়া অন্যের শক্তিকে ক্ষুদ্র মনে করা উচিত নহে। বরং চিন্তা-স্রোত তাহার বিপরীত পথে চালিত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যে যাহা করিয়াছে আমিও তাহা পারিব, চিন্তাশক্তি পরিচালনের এই প্রথম সূত্র। আমার শক্তির উদ্বোধনজন্য হয় দশবার, নয় শতবার চেষ্টা করিতে হইবে, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। পৃথিবী বিপুলা; আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের অভাব নাই। মনে যাহাকে প্রধান বলিয়া বিশ্বাস হয় তাহাকে আদর্শ ধরিতে হইবে। তৎপর তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

সুতরাং উদ্যমশীল বালক! শক্তির আরাধনা কর। তোমার মনের বল প্রবুদ্ধ হইলে তুমি সামান্য মানব হইতে উপরে উঠিতে সমর্থ হইবে। তোমার স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের নির্ম্মল-আলোক-বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া শত শত বালক যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। সাধু চেষ্টা সর্ব্বত্র সিদ্ধার্থ, এ কথা কখনও ভুলিও না।

জীবনের উদ্দেশ্য।

ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধে আমরা অনেকগুলি কথা বলিয়াছি; আর একটী বিষয়ে কয়েকটী কথা লিখিয়া উপসংহার করিব।

জীবনের এক প্রান্তে জন্ম, অন্য প্রান্তে মৃত্যু; সাধারণের দৃষ্টিতে উভয়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন; জন্মের পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞানাতীত, মৃত্যুর পরের অবস্থাও মানবনেত্রের বিষয় নহে। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি এই মাত্র। কিন্তু এ কথা সকলেই জানি জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, জন্ম মৃত্যুর বিজ্ঞাপন মাত্র। আমরা পার্থিবজীবনে যাহাকে বড় হওয়া বলি, তাহাই ছোট হওয়া; যে যত বড়,সাধারণতঃ দেখিতে গেলে তাহার মৃত্যু তত নিকট। দিন ফুরায় সত্য; কিন্তু শরীরের দিন ফুরায়, আত্মার নহে। শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, মৃত্তিকায় মিশিয়া যায় বা অন্য প্রাণীর উদরস্থ হয়; শরীর থাকে না, কিন্তু আত্মারধ্বংস হয় না।

পরকাল আছে এ কথা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করা যায়। জগতে এ পর্য্যন্ত চিন্তাশীল যত জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সকলেই অসন্দিগ্ধচিত্তে পরকাল স্বীকার করিয়াছেন। কেহবা দেহান্তর স্বীকার করেন, কেহ করেন

না এইমাত্র প্রভেদ। আত্মা যে নিত্য, অবিনশ্বর সুতরাং অনন্ত, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

সুতরাং মানবজীবন কেবল এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নহে। অনন্ত-কালসমুদ্রের একটী ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌-স্বরূপ এই শরীরের সহিত আত্মা কখনও বিনষ্ট হইবে না। এই জীবনে অনুষ্ঠিতকার্য্যের ফলাফল আমাদিগকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে, কারণ আত্মাই একমাত্র ফলভোগী।

অতএব আমাদের জীবনের প্রত্যূষ সময় হইতে কর্ত্তব্যসমূহের এক একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে :—জীবনের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, গন্তব্য পথই বা কোথায়, সে সমস্ত পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইতে হইবে। মানব প্রকৃতিহস্ত-নিক্ষিপ্ত বর্ত্তুল মাত্র নয় যে, সে কিরূপে বিক্ষিপ্ত হইল, কোথায়ই বা পতিত হইবে, তাহা কিছুই জানে না। তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে, পাপ পুণ্য আছে, সুখ দুঃখ আছে; আছে বলিয়াই তাহার সাবধান হইবার প্রয়োজন। লোষ্ট্রখণ্ডের সে সাবধানতার প্রয়োজন নাই।

উদ্দেশ্যবিহীন জীবন আর উন্মত্তের কল্পনা একরূপ, অস্থায়ী ও নিষ্ফল। যাহার জীবনের কোনও একটী লক্ষ্য নাই, যে কোন পথে কিরূপে যাইবে তাহা জানে না, তাহার আবার মনুষ্যত্বের গৌরব কোথায়? বায়ুমধ্যে

চালিত শায়কের পথ যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না, লক্ষ্যবিহীন জীবনও ঠিক তাই। যাহার লক্ষ্য স্থির আছে, তাহার জীবনবর্ত্মে দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে না। জীবনসমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় যে সাবধানে আপনার অভীষ্ট নক্ষত্রে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে, সে একদিন অবশ্যই উদ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবে সংশয় নাই।

মানবজীবনে যদি লক্ষ্য স্থির না থাকে, তাহা হইলে তরঙ্গ-তাড়িত কর্ণবিহীন নৌকার ন্যায় একবার এদিকে, একবার ওদিকে, বিক্ষিপ্ত এবং পরিশেষে নিমগ্ন হইতে হয়। মনুষ্যের পানভোজন, শয়নোপবেশনাদি কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত করিলে মনুষ্যের কার্য্য শেষ হইল না, কারণ তাহা সাধারণ কার্য্য এবং স্থূলাংশ মাত্র। তাহার আবার সূক্ষ্মাংশ আছে।

এই উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত মানবের কর্ত্তব্য কি তাহাই বিবেচনার বিষয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে সামান্য সম্পত্তির অধিকারী করেন নাই। সমস্ত প্রাণি-জগৎ উদ্ভিজ্জ-জগৎ, জল, স্থল, শূন্য, সমস্ত খনিজপদার্থ, আলোক, বায়ু, প্রভৃতি তাহার আপন সম্পত্তি। সে যাহা যেরূপে ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতেছে। তাহার ভয়ে জগৎ কম্পিত,

তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস নাই। এই পৃথিবীতে দেহপিঞ্জর-বদ্ধ মানবের এত ক্ষমতা। ক্ষমতা আছে সত্য, তাহার উপর আবার একটী শাসন-সূত্রও আছে। সে যেমন রাবণের ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণকেও আজ্ঞাধীন করিতেছে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে অব্যাহত গমনাগমন করিতেছে, তেমনই আবার পাপপুণ্য ও কর্ম্মফলদ্বারা তাহার কৃতকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। যে সেই কর্ম্মফল স্মরণ রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, সেই নিরাপদে চলিতে পারে।

সুবোধ বালক! জীবনের প্রথম হইতে এই একটী কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ, "জীবনে কাহারও অপকার করিব না।" পরোপকার করিতে সকলের সমান শক্তি থাকে না; কিন্তু অপকার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপকার করিতে সমর্থ হইলে সে অতি উত্তম কথা। যে নিঃস্বার্থভাবে সংসারে যথোচিত উপকার বিতরণ করে সে ইহলোকে দেবতা। যে, উপকার করিতে না পারিলেও কখনও অপকার করিবে না এইরূপ ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, সে মানব; তাহার জন্মও সার্থক। কিন্তু যে শক্তি-সত্ত্বেও পরোপকার করে না, যাহার, পরানিষ্ট সম্পাদনই জীবনের সঙ্কল্প, সে পিশাচ; তাহার জীবন ঘৃণার্হ। তাহার আত্মার অধোগতি অনিবার্য্য। সুতরাং যদি তুমি জীবনের পূর্ব্বাহ্নে পরানিষ্ট করিবে না

বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া লও, আর সৌভাগ্যক্রমে সেই সঙ্কল্পের রক্ষা হয়, তাহা হইলে পরোপকার-সাধন আপনা হইতে হইবে।

"সত্যের অপলাপ করিব না", জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য এই আর একটী প্রধান প্রতিজ্ঞা। যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা বা ভয় হয় তাহাই অকার্য্য, তাহাই বর্জ্জনীয়। পাপপুণ্য নির্ণয় করিতে এ লক্ষণটী অতি সহজ। যে কার্য্য সাধন করিলে মন প্রফুল্ল হয়, কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ হয না, তাহাই সৎ-কার্য্য, তাহার বিরুদ্ধ সমস্ত অসৎকার্য্য। জীবনে মিথ্যা ব্যবহার করিবে না বলিয়া যদি তুমি দৃঢ়সঙ্কল্প হও, তাহা হইলে তোমার আত্মা নিশ্চয় কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে।

"ঈশ্বর আছেন, আমি যাহা করি কেবল তাহা নহে, যাহা ভাবি তাহাও তিনি অবগত আছেন" এ সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা থাকা জীবনের আর একটী প্রয়োজন। বালক! তোমার হৃদয়ে নিয়ত এই সত্য জাগরূক থাকিলে কুকার্য্যে মতি কিরূপে হইবে? এক জন বিচারক আছেন, তাঁহার নিকট সাক্ষী প্রমাণ লাগে না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী; পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। যদি ক্ষণৈকের জন্যও তুমি এই সত্য বিস্মৃত না হও, তাহা হইলে

তোমার মন ধর্ম্মে স্থির লক্ষ্য রাখিতে পারিবে। উল্লিখিত তিনটী বিষয় যাহার আয়ত্ত, বিবেক তাহার চিরসঙ্গী। সে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও পাপবাসনা মনে স্থান দেয়, বিবেক আসিয়া তাহার কাণে কাণে নিষেধ করে, সে অমনি যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠে, তাহার মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, আর পাপকার্য্য করিতে তাহার সাহস হয় না। যে ব্যক্তির ঐ তিনটী বিষয়ের অভাব, তাহার বিবেকও মূক,—তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। প্রিয় বালক! ঐ তিনটী বিষয় তুমি আপন সম্পত্তি করিয়া লও, সমস্ত মানবধর্ম্ম তোমার আয়ত্ত হইবে, আত্মার উন্নতির আর কোনও বিঘ্ন থাকিবে না, তুমি ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় শৈশব হইতে ধর্ম্মপথের পান্থ হইবে।

যেমন মানসিক উন্নতির পক্ষে ঐ তিনটী বিষয়ে নিয়ত লক্ষ্য থাকা আবশ্যক, তেমনই পার্থিব উন্নতির পক্ষেও জীবনের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকার প্রয়োজন। জননী এবং জন্মভূমির প্রতি সমান ভালবাসা রাখিতে হইবে; এবং "লোকে যেন আমাকে ভুলিয়া না যায়" এই একটী কথা মনে রাখিয়া,—কার্য্যক্ষেত্রে এই একটী লক্ষ্য স্থির রাখিয়া,—ঐহিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। অসৎকার্য্য যত গুরুতর, যত ভীষণ হউক না কেন, জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার

দৃষ্টান্ত-স্থলে কিছু দিন স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিলেও তাহা চিরস্মরণীয় নহে। পথে গমনকালে কোন বী, ভৎস কাণ্ড, নিতান্ত ঘৃণার্হ বিষয় লক্ষ্য করিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু কাল তাহা মনে উদয় হয় সত্য, কিন্তু তাহা নিষ্ঠীবন ত্যাগ এবং বিস্মরণবাসনা বৃদ্ধি করে এই মাত্র। বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি তাঁহার অতুল্য ভাষায় এইরূপে অমরত্ব বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে'
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

লোকে ভুলিবে না এবং মনের মন্দিরে চিরকাল পূজা করিবে মানবের আকাঙ্ক্ষার চরমোৎকর্ষ এই মানবের চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিলে অভীষ্টও লাভ হয়। দৃষ্টান্তের অভাব নাই যশোমন্দিরযাত্রিগণের ইতিহাস পাঠ কর।

শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী ; লক্ষ্মণ তাঁহার একমাত্র সহায়। একদিকে অমিত-প্রতাপ রাজাধিরাজ রাবণ লঙ্কা এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর, চন্দ্রসূর্য্যবায়ুবরুণ-সেবিত প্রকৃতিদেবী তাঁহার কিঙ্করী, সমুদ্র তাঁহার পরিখা ; অন্যদিকে নির্ব্বাসিত, স্বজনবন্ধু-বিবর্জ্জিত, দূরদেশগত এবং পত্নী-বিরহে জীবন্মৃত রামচন্দ্র। রামের প্রতিজ্ঞা, রাবণকে পরাস্ত করিয়া সীতা উদ্ধার করিবেন। শুনিতে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু মনের বলের নিকট অসম্ভব

রামের লক্ষ্য স্থির ছিল, সুতরাং সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। রাম অমর; সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে তাঁহাকে কেহ ভুলিয়া যায় নাই, যাইবেও না। তাঁহার কবি বাল্মীকিও অমর; কারণ তিনিও আপন উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছেন।

এক দিকে দুর্য্যোধনের অদম্য রাজশক্তি, ভারতবর্ষে একরূপ একাধিপত্য, অন্যদিকে বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব,—ভিক্ষান্নজীবী, ছদ্মবেশী, বিড়ম্বিত, নির্ব্বাসিত পঞ্চপাণ্ডব প্রতিজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে সম্রাট্ হইবেন; বামনের চন্দ্র ধরিতে হস্ত প্রসারণের ন্যায় তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধনের উপহাসের বিষয় হইল। কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ সর্ব্বদাই সফলমনোরথ। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমাধিলাভ করিল, পঞ্চপাণ্ডব সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, যশঃসৌরভ যুগযুগান্ত বিস্তৃত হইল। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সত্যানুরাগ, ভীমের বাহুবল এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, অর্জ্জুনের স্থিরবীর্য্য এবং অতুলশিক্ষা জগৎ কখনও বিস্মৃত হইবে না। তাঁহারা অমর, তাঁহাদের কবি ব্যাসদেবও অমর।

ভগবান্ শাক্যসিংহ মানবের শোকদুঃখে অধীর হইয়া মানবমনে শান্তিসুধা বিতরণ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তজ্জন্য স্নেহপরায়ণ পরমারাধ্য জনক, পতিপরায়ণা প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয়দর্শন সুকুমার তনয়, রাজ-

বিভব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সন্ন্যাসী হইলেন পরিশেষে অশেষবিধ অধ্যয়ন, জ্ঞানান্বেষণ এবং কঠো তম তপস্যাদ্বারা তিনি সিদ্ধার্থ হইলেন। আজ সা চতুঃপঞ্চাশৎকোটি লোক তাঁহার শিষ্য। বুদ্ধদেব অম

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম পতনোন্মু ভারতবর্ষ বৌদ্ধময় হইল। তখন দক্ষিণাত্যে মহামহ পাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। তেমন অ বয়সে তাদৃশ অসাধারণপাণ্ডিত্য, অলৌকিকবিতণ্ডা ক্ষমতা পৃথিবী বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বৌদ্ধপণ্ডিতগণকে পরাস্ত এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিবেন। তখন তিনি বালকমাত্র। আগ্নেয়গিরিগহ্বর-নিঃসৃত দ্রবধাতু ন্যায় এই জ্বলন্ত প্রতিভা দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে বাহির হইল। সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত সেই বালকের নিকট পরাজয়-স্বীকারপূর্ব্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; সেই জয়স্থল সমূহে শতাধিক মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। যাঁহারা অপমান বোধ করিলেন তাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থানে প্রস্থান করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম ভারতে পুন স্থাপিত হইল। শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধার্থ। তাঁহার তিরোভা সময়ে বয়স দ্বাত্রিংশদ্বৎসর মাত্র। শঙ্করাচার্য্য অমর।

একবার খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অপরাহ্ন এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রত্যূষকালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর